শ্রীমৎ রঘুনাথদাস গোস্বামীর জীবন-চরিত।

শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী প্রণীত

ও

মৈনা—শ্রীহট্ট হইতে

শ্রীঅনিরুদ্ধচরণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা,

বহুবাজার, শ্রীনাথ দাসের লেন, ১৭ নং ভবনস্থ,

বি, কে, দাস এবং কোম্পানীর যন্ত্রে

শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০০।

দ্রষ্টব্য।

নিম্নলিখিত শ্লোকটী গ্রন্থ-মধ্যস্থ প্রথম টীকার নীচে পাঠ করিতে হইবে।

যথা পদ্মোত্তর-খণ্ডে—

"যথা সৌমিত্রিভরতৌ যথা সঙ্কর্ষণাদয়ঃ।
তথা তেনৈব জায়ন্তে নিজলোকাদ্যদৃচ্ছয়া॥
পুনস্তেনৈব গচ্ছন্তি তৎপদং শাশ্বতং পরং।
ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে॥"

ইহার ভাব এই যে, নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণের জন্মাদি মুকুন্দবৎ অর্থাৎ তাঁহারা লীলার সাহায্যার্থ অবনীতে আইসেন এবং পুনর্ব্বার তৎসহ নিত্য ধামে গমন করিয়া থাকেন। ইতি।

———o———

নিবেদন।

শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গ ভক্ত ও পার্ষদ বৈষ্ণব-চূড়ামণি রঘুনাথ দাসের জীবন অলৌকিক বৈষ্ণবতা পূর্ণ; ঐ জীবনী যত আলোচিত হয়, বৈষ্ণব-জগতে ততই উপকার। এই জীবনীটি পূর্ব্বে বৈষ্ণব পত্রিকায় প্রকাশিত হয়; ইহা যে কখনও পুনর্মুদ্রিত হইবে, তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই।

দুই মাস পূর্ব্বে অত্রত্য পূজনীয়া স্বধর্ম্ম-পরায়ণা শ্রীযুক্তা কৃষ্ণপ্রিয়া চৌধুরাণী বৈষ্ণবে ইহা পাঠ করেন। পাঠান্তর তিনি আমাকে ডাকিয়া, ইহা পুস্তকাকারে পুনঃ প্রকাশ করিতে অতি আগ্রহ সহকারে অনুরোধ করেন; এমন কি—এতদর্থে অর্থ সাহায্যেও তিনি কুণ্ঠিতা হন নাই। তাঁহার এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে না পারাতে আমাকে ইহা প্রকাশ করিতে হইল।

এই গ্রন্থ প্রকাশে যে যে বৈষ্ণব মহাত্মারা আমাকে সাহস দিয়াছেন ও অন্যান্য রূপে সাহায্য করিয়াছেন, এই স্থানে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতেছি। তাঁহাদের কৃপাই এই গ্রন্থ প্রকাশের মুখ্যতম হেতু।

আমি এ কার্য্যের অনুপযুক্ত হইলেও বৈষ্ণবাদেশ আমাকে উৎসাহিত করিয়াছে; যাহা হউক, কৃপা পূর্ব্বক সকলে আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। ইতি।

শ্রী অচ্যুতচরণ দাস চৌধুরী।



উৎসর্গ।

যিনি সরলতা ও উদারতা গুণে সবারই প্রীতি আকর্ষণ
করিয়াছিলেন, যিনি অতি সত্য-পরায়ণ
ছিলেন এবং দীন দুঃখী দেখিলে
যাঁহার দয়ার উৎস
উচ্ছ্বসিত
হইয়া উঠিত, যিনি
সরল বিশ্বাসী ও পরম ধর্ম্মশীল
ছিলেন, সেই পরম আরাধ্য গোলোক-
গত পিতা শ্রীঅদ্বৈত চরণ চৌধুরী মহাশয়ের
পবিত্র নামে এই গ্রন্থ খানি উৎসর্গ করিলাম।

ইতি।

মৈনা, শ্রীহট্ট। | দীন হীন
কার্ত্তিক, গৌরাব্দ ৪০৮। | শ্রীঅচ্যুতচরণ দাস চৌধুরী।

বি কে, দাস কোং
যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কন
সুলভ।

শ্রীমঙ্গলাচরণ।

সর্ব্বাদৌ সর্ব্ব-সন্তাপহারী শ্রীহরির চরণে মঙ্গলাচরণ স্বরূপ নয়ের পদ দুটী দিলাম।

(১)

দয়ালু দয়ালু মোর শ্রীগৌর সুন্দর।
দুঃখী তাপী জনে তাঁর কৃপা নিরন্তর॥
শান্তির আশায়, জগতে ভ্রমিনু,
কাহাকেও নাহি পাইনু।
দৈবে অবশেষে, শ্রীনাম শুনিয়া,
গৌরাঙ্গ শরণ লৈনু॥
অধম জানিয়া, দুঃখীর ঠাকুর,
চাহিয়া দেখিল মোরে।
তাপ অবসাদ, সব পলাইল,
দূরে দূরে দূরান্তরে॥
হেন দয়াময়, গৌরাঙ্গ আমার,
এবে কর্ম্ম বশে হায়।
তাঁহারে ভুলিয়া, বৈষ্ণব দাসের,
বৃথায় জীবন যায়॥

(২)

হে গৌর-সুন্দর, পরাণ-রতন,
সুবর্ণ মাণিক মণি।
তুমি সে আমার, জীবন সম্বল,
তুমি সে প্রেমের খনি॥

এস এস নাথ, হৃদয় মাঝারে,
তোমারে ভরিয়া রাখি।
তা'হলে কখন, পলাতে নারিবে,
অধীনেরে দিয়া ফাঁকি ॥
তব বাস যোগ্য, নহে এ হৃদয়,
শুধিতে যতন পাই।
দুর্দ্দৈব প্রবল, নাশে মনোবল,
মরমে মরিয়া যাই ॥
এ দুঃখ-কাহিনী, কাহাকে কহিব,
কে বুঝিবে মোর ব্যথা।
অতএব নাথ, সরল অন্তরে,
নিবেদিনু মন কথা ॥
বামনের চন্দ্র, ধরার মতন,
সত্য সে কল্পনা মোর।
তবু আশা প্রভো, জানি দীনজনে,
অহেতু করুণা তোর ॥
তবে এস, এস, এস প্রাণপতে,
সকাতরে ডাকি পুনঃ।
তব শুভ দৃষ্টে, সুনির্ম্মল হবে,
নিশ্চয় এ পাপ মন ॥
শ্রীবৈষ্ণব দাস, পাতকী অভাগা,
পুরাবে কি আশা তায়।
এ হৃদি-সরোজে, তব শ্রীচরণ,
হেরিবে কি দুরাচার ॥

শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবন-চরিত।

পূর্ব্বার্দ্ধ।

তিনি কে? তাঁহার বিবাহ।

হুগলী জেলার অন্তর্গত সপ্তগ্রামে হরিপুর নামে একটী স্থান আছে। ৪০০ চারিশত বৎসর পূর্ব্বে এই হরিপুর একটী সৌষ্ঠব-শালী বড় গ্রাম ছিল। তৎকালে হরিপুরে হিরণ্য দাস ও গোবর্দ্ধন দাস নামে দুই জন মহা সম্ভ্রান্ত লোক বাস করিতেন। ইহাঁরা সহোদর ভ্রাতা. তন্মধ্যে হিরণ্য দাস জ্যেষ্ঠ, এবং গোবর্দ্ধন কনিষ্ঠ। ইহাঁরা জাতিতে কায়স্থ; ইহাঁদের মজুমদার খ্যাতি ছিল। ইহাঁরা তত্রত্য ভূম্যধিকারী ছিলেন। প্রজার নিকট হইতে বিংশতি লক্ষ টাকা রাজস্ব-স্বরূপ বার্ষিক আদায় হইত। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দাস এতাদৃশ সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন।

হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দাস অতিশয় বদান্য ছিলেন। নবদ্বীপের অনেক ব্রাহ্মণ-সন্তানকেই ইহাঁদের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে

হইত। নবদ্বীপের নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী অতি প্রসিদ্ধ লোক, সুতরাং তাঁহার সহিত ইঁহাদের বিশেষ পরিচয় ছিল। অপিচ ইঁহারা (প্রভুর পিতা) মিশ্র পুরন্দরের অতি অনুগত ছিলেন।

এই ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে কনিষ্ঠ গোবর্দ্ধন দাসের ১৪২০ শকে একটী পুত্র হয়, ঐ পুত্রের নাম রঘুনাথ দাস। এই রঘুনাথ দাস অতি আশ্চর্য্য বস্তু। অতি বাল্যকাল হইতেই তিনি সংসারে উদাসীন-প্রায় ছিলেন। যখন শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুর (যিনি সাধারণতঃ যবন হরিদাস নামেই প্রসিদ্ধ) কয়েক দিবসের জন্য হরিপুরের নিকটবর্ত্তী চাঁদপুর গ্রামে যান, তখন রঘুনাথ তাঁহার পরিচর্য্যাদি করিয়া তদীয় কৃপাভাজন হন। ঐ সময় রঘুনাথ তাঁহাদের পুরোহিত বলরাম আচার্য্যের গৃহে অধ্যয়ন করিতেন।

সাধু ভক্তের কৃপাই ভগবচ্চরণ লাভের উপায় স্বরূপ। কে বলিতে পারে যে, রঘুনাথের প্রতি হরিদাসের এই কৃপাই ভবিষ্যতে তাঁহার গৌর-চরণ প্রাপ্তির কারণ না হইয়াছিল ?

রঘুনাথ যখন বালক, তখন সমস্ত বঙ্গভূমি এক অভিনব তরঙ্গে তরঙ্গায়িত, এক নূতন বন্যায় আপ্লাবিত। তখন আমাদের প্রভু প্রকাশিত হইয়াছেন; তখন অনেকেই জানিতে পারিয়াছেন যে, নদীয়ার সেই চঞ্চল "ব্রাহ্মণ-কুমারটী" অন্য কেহ নহেন,—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন!

দেশ দীর্ঘ কাল যাবৎ মোহাচ্ছন্ন ছিল; শ্রীগৌরাঙ্গের হরি হরি ধ্বনিতে দেশের মোহ বিদূরিত হইয়াছে, নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে; কিন্তু দেশ তখনও বুঝিতে পারিতেছে না যে, এ কি? তাই সে সুপ্তোত্থিত

দেশ তখন বিমূঢ়বৎ হইয়া আছে। তখন আমাদের প্রভুর নাম জানিতে বাঙ্গালায় আর কাহারও বাকি ছিল না। রঘুনাথ দাস শ্রীগৌরাঙ্গের নাম শুনিলেন, আর তাঁহার চরণে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। রঘুনাথের এ আত্ম-সমর্পণ নূতন নহে। তিনি জন্মে জন্মে ঐ শচীনন্দনের চরণেই জীবন যৌবন সমর্পণ করিয়া থাকেন, নতুবা নাম শুনিয়াই আত্ম-সমর্পণ কে কোথায় দেখিয়াছেন? রঘুনাথ কৃষ্ণ-লীলায় রসমঞ্জরী ছিলেন; আর কেহ কেহ তাঁহাকে রতিমঞ্জরীও বলিয়া থাকেন।* যথা গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়াং—

দাসশ্রীরঘুনাথস্য পূর্ব্বাখ্যা রসমঞ্জরী।
অমুং কেচিৎ প্রভাষন্তে শ্রীমতীং রতিমঞ্জরীং॥

শ্রীগৌরাঙ্গের নাম শুনিয়াই রঘুনাথ তাঁহার চরণে আত্ম-সমর্পণ করিলেন, আর তখন হইতেই তদীয় হৃদয়-নিহিত অনুরাগ-বহ্নি তীব্র তেজে জ্বলিয়া উঠিল। তখন তাঁহার মনে ধৈর্য্য মাত্র থাকিল না। আহার, নিদ্রা, বেশ ভূষা, সাংসারিক সুখাভিলাষ, সমস্ত তিনি ত্যাগ করিলেন। তাঁহার অতি প্রিয় যে শাস্ত্রাভ্যাস, তাহাতেও

---

* এই আবির্ভাব তত্বটী নব্যভারতে নিম্নোদ্ধৃত রূপে প্রকাশিত হয়।— "বিশেষ বিশেষ পাত্রে, বিশেষ বিশেষ ভাব ও শক্তি অবতীর্ণ হইয়া ভগবল্লীলার সহায়তা করে, এ সত্য কে না স্বীকার করিবে? যেমন সনকাদিতে শান্ত ভাব, ধ্রুব প্রহ্লাদে দাস্য ভাব, রুক্মিণী সত্যভামায় প্রেম ভাব অবতীর্ণ, তেমনি আবার সনকাদির শান্ত ভাব শাক্যসিংহ প্রভৃতিতে, প্রহ্লাদের দাস্য ভাব যবন হরিদাসে, ও রুক্মিণী সত্যভামায় প্রেম ভাব (গৌর-লীলায়) গদাধর পণ্ডিত ও জগদানন্দ পণ্ডিতে অবতীর্ণ।" ইত্যাদি।

নব্যভারত ১১শ খণ্ড ১৪১ পৃষ্ঠা।

আর মন ধায় না। এই অবস্থায় বালক রঘুনাথ, পিতা মাতা, বন্ধু-বান্ধব, ও অতুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত সম্মিলনের আশায় রাত্রি-যোগে একাকী পলাইতে কয়েক বার চেষ্টা করেন, কিন্তু পারেন নাই। রঘুনাথের পিতা পুত্রের ঈদৃশ আচরণে ভীত হইয়া, যাহাতে তিনি আর পলাইতে না পারেন, এই অভিপ্রায়ে তাঁহার রক্ষার্থ পাঁচ জন প্রহরী, এবং বুঝাইয়া রাখিবার জন্য একজন ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিলেন।

রঘুনাথ পিতা মাতার একমাত্র সন্তান, অতি আদরের ধন। তাঁহার বিষয়ে গোবর্দ্ধন দাসের মনে এরূপ ভীতি সঞ্চারিত হইয়াছিল যে, প্রহরী নিযুক্ত করিয়াও তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না, তাঁহাকে সংসারে দৃঢ় রূপে আবদ্ধ করার জন্য সেই অল্প বয়সেই (তাঁহার সেই সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালেই) একটী উপযুক্ত-বয়স্কা পরম লাবণ্যবতী বালিকার সহিত বিবাহ দিলেন। নব বধূর অঙ্গ-সৌষ্ঠব, সৌন্দর্য্যরাশি, ও সদ্গুণাবলী দর্শনে রঘুনাথের জননী অনেক পরিমাণে আশ্বস্তা হইলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে, তাঁহার লক্ষ্মী-সদৃশী বধূটীকে আর রঘুনাথ পরিত্যাগ করিতে পারিবে না।

প্রথম মিলন ও পলায়নে অক্ষমতা।

এই যে ঘটনার উল্লেখ করা গেল, তাহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। চব্বিশ বৎসরের শেষে অর্থাৎ ১৪৩১ শকের মাঘ মাসে (শুক্ল পক্ষে) প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ

করিয়া নীলাচল গমন করেন, এবং পরে তথা হইতে শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুর বাটীতে আসেন। সন্ন্যাসের পর এই তাঁহার দ্বিতীয় বারের আগমন।

রঘুনাথের পূর্ব্ব হইতেই প্রভুর সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছা ছিল (ইহা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে), কিন্তু এত দিন যাইতে পারেন নাই। এখন প্রভু শান্তিপুরের নিকটে আসিয়াছেন জানিয়া অতি বিনম্র হইয়া পিতাকে কহিলেন, "পিতঃ, একবার মাত্র আমাকে যাইতে দিন; যদি না দেন, তবে আমার প্রাণ থাকিবে না।" আহা, কি অদ্ভুত উদ্বেগ! কেমন আশ্চর্য্য আকর্ষণ! যাহা হউক, পুত্রের এতাদৃশ আর্ত্তি দর্শনে গোবর্দ্ধন নিষেধ করিতে পারিলেন না, লোক জন সঙ্গে দিয়া শান্তিপুরে পাঠাইয়া দিলেন।

রঘুনাথ শান্তিপুরে প্রভুকে দর্শন পূর্ব্বক প্রেমাবিষ্ট হইয়া তাঁহার চরণে নিপতিত হইলেন। তাহাতে তথায় তাঁহার প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গের করুণা হইল। রঘুনাথ সাত দিবস শান্তিপুরে রহিলেন, এবং মনের আনন্দে নিজের কথা প্রভুর শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন। যদিও রঘুনাথ অতি আনন্দিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার মন সম্পূর্ণ স্থির ছিল না। সেখানে, প্রভুর চরণ-সন্নিধানে বসিয়া তিনি মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "প্রভো! আমি এই বন্ধন কি ছেদন করিতে পারিব? এই দুরন্ত প্রহরীদের হস্ত হইতে কি আমি পরিত্রাণ পাইব? তুমি কি আমার আশা পুরাইবে?—তোমার শ্রীচরণে কি স্থান দিবে?"

শ্রীগৌরাঙ্গ অন্তর্যামী ভগবান্; তিনি রঘুনাথের মনের কথা

অবগত হইয়া, তাঁহাকে মৃদু মধুর বাক্যে, এই বলিয়া আশ্বাস দিলেন। যথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"স্থির হইয়া ঘরে যাও, না হইও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক, ভব-সিন্ধু-কূল॥
মর্কট বৈরাগ্য না করিও, লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ, অনাসক্ত হইয়া॥
অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক-ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা, করিবেন উদ্ধার॥"

গৃহস্থ বৈষ্ণবের কিরূপ আচরণ করা কর্ত্তব্য, এই অপূর্ব্ব ইঙ্গিত বাক্যে রঘুনাথের প্রতি উপদেশচ্ছলে, প্রভু এইরূপে তাহা কহিয়াছেন। যাহা হউক, তৎপরে বলিতেছেন—

"বৃন্দাবন দেখি যবে, আসিব নীলাচলে।
তবে তুমি আমাপাশ, আসিও কোন ছলে॥
সে কালে সে ছল, কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে।
কৃষ্ণ কৃপা যাঁরে, তাঁরে কে রাখিতে পারে॥"

ধীর ভাবে রঘুনাথ এই আশ্বাস-বাক্য শুনিয়া বাড়ী আসিলেন। প্রভুর শ্রীমুখের আশ্বাসে তাঁহার মনের উদ্বেগ অনেক পরিমাণে বিদূরিত হইল; তিনি প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। রঘুনাথ মনের ভাবোচ্ছাস গোপন রাখাতে পিতা মাতা পুত্রের আর তেমন উন্মাদ-ভাব নাই দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন।

এই প্রকারে কিছু দিন অতিবাহিত হইলে একদা তিনি শুনিতে

পাইলেন যে, মহাপ্রভু বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন। যেমন সংবাদ শুনিলেন, আর অমনি বাহির হইবার জন্য একবারে উথলা হইয়া উঠিলেন। কিন্তু একটী সাংসারিক দুর্ঘটনা আরো এক বৎসরের জন্য তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। সে দুর্ঘটনার সার মর্ম্ম এই—

পূর্ব্বে এক ম্লেচ্ছ সপ্তগ্রামের অধিকারী ছিল; পশ্চে হিরণ্য দাস তাহাকে অধিকার-চ্যুত করায়, সে মনে মনে তৎপ্রতি বড় ক্রুদ্ধ হয়। অনন্তর কোন সূত্রে রাজ-সাহায্যে যবন ইহাঁদিগকে ধরাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু পূর্ব্বে সংবাদ পাইয়া ইহাঁরা সপরিবারে পলায়ন করেন। কিন্তু রঘুনাথের মন প্রাণ গৌরাঙ্গ-চরণে উৎসর্গীকৃত, তিনি সংসারের বড় একটা ধার ধারেন না, সুতরাং যবন-হস্তে বন্দী হইলেন। বন্দী অবস্থায় যবনেরা তাঁহাকে নানা প্রকার ভয় দেখাইত, কখন বা প্রহারে উদ্যত হইত, কিন্তু রঘুর কমনীয় কলেবরে প্রহার করিতে পারিত না। এক দিন সেই বিপক্ষ যবন,রঘুনাথের অপূর্ব্ব বাক্য শ্রবণে এবং মনোহর রূপমাধুরিতে বিমোহিত হইয়া, তাঁহাকে মুক্ত করাইয়া দিল; এবং রঘুনাথও পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতের সহিত ঐ যবনের সম্মিলন করাইলেন। এই প্রকারে তাঁহাদের দীর্ঘ কালের বিবাদের অবসান হয়।

রঘুনাথ মুক্ত হইয়াই আবার পলাইতে চেষ্টা করিলেন, এবং এক দিন রাত্রে বাড়ী ছাড়িয়া চলিলেন; কিন্তু তাঁহার পিতা অল্প দূর হইতেই তাঁহাকে ধরাইয়া আনাইলেন। রঘুনাথ বাড়ীতে মুহূর্ত্তের জন্যও শান্তি পান না, তাই তিনি আবার পলাইলেন ও

অচিরেই ধৃত হইলেন। এইরূপে বার বার পলায়ন করাতে তাঁহার মা বিরক্ত হইয়া কহিলেন—

"পুত্র বাতুল হৈল, রাখহ বান্ধিয়া।"

পিতা পুত্রের প্রেমোন্মাদ বুঝিতে পারিয়া উত্তর করিলেন—

"ইন্দ্র সম ঐশ্বর্য্য ভোগ, স্ত্রী অপ্সরা সম।
ইহাতে বান্ধিতে যার, নারিলেক মন॥
দড়ির বন্ধনে তারে, রাখিবে কিমতে।
জন্ম-দাতা পিতা নারে, প্রারব্ধ খণ্ডাইতে॥
চৈতন্য চন্দ্রের কৃপা, হইয়াছে ইহারে।
চৈতন্য প্রভুর বাতুল, কে রাখিতে পারে॥"

(শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত।)

এই উত্তরে, বলা বাহুল্য যে, রঘুনাথের জননী নিরুত্তর রহিলেন।

——(•)——

পাণিহাটী গমন—দণ্ড মহোৎসব।

এই সময়ে নিত্যানন্দ প্রভু সন্নিকটবর্ত্তী পাণিহাটী গ্রামে ছিলেন। এই পাণিহাটীতে যে অদ্ভুত লীলা হয়, তাহার বর্ণন করার সাধ্য নাই; তাহার আভাস মাত্র নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি-নিচয়ে দেখিবেন। যথা—

"হেন মতে নিত্যানন্দ, পাণিহাটী গ্রামে।
রহিলেন সকল পার্ষদগণ সনে॥"
"নৃত্য করিবার ইচ্ছা, হইল অন্তরে।
গায়ন সকল আসি, মিলিলা সত্বরে॥"

'নিত্যানন্দ স্বরূপের, প্রেম দৃষ্টি পাতে।
সবার হইল, আত্ম বিস্মৃতি দেহেতে॥"
"যে ভক্তি গোপিকাগণে, কহে ভাগবতে।
নিত্যানন্দ হইতে তাহা, পাইল জগতে॥"
নিত্যানন্দ বসিয়া আছেন, সিংহাসনে।
সম্মুখে করয়ে নৃত্য, পারিষদ গণে॥
কেহ গিয়া বৃক্ষের, উপর ডালে চড়ে।
পাতে পাতে বেড়ায়, তথাপি নাহি পড়ে॥"
"কেহ বা গুবাক বনে, যায় নড় দিয়া।
গাছ পাঁচ সাত গুয়া, একত্র করিয়া॥
হেন সে দেহেতে, জন্মিয়াছে প্রেমবল।
তৃণপ্রায় উপাড়িয়া, ফেলায় সকল॥"
"যে দিকে দেখেন, নিত্যানন্দ মহাশয়।
সেই দিকে মহাপ্রেম, ভক্তি বৃষ্টি হয়॥
যাহারে চাহেন, সেই প্রেমে মূর্চ্ছা পায়।
বস্ত্র না সম্বরে, ভূমে পড়ি গড়ি যায়॥"
"এইরূপে পাণিহাটী গ্রামে, তিন মাস।
নিত্যানন্দ প্রভু করে, ভক্তির বিলাস॥"

(ইত্যাদি, শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে।)

এই প্রকারে যখন নিত্যানন্দের প্রেম-সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইয়া সমস্ত জগৎ ভাসাইয়া দিতেছে, যখন স্ত্রী-বালক, বৌদ্ধ-যবন, চোর-দস্যু, তার্কিক-নাস্তিক পর্য্যন্ত সে সমুদ্রে ডুবিতেছে, তখন

রঘুনাথ পিতার আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক পাণিহাটীতে উপস্থিত হইলেন। যখন পৌঁছিলেন, তখন প্রভু নিত্যানন্দ গঙ্গাতীরে একটী বৃক্ষমূলে চতুর্দ্দিকে ভক্ত-পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া ছিলেন। রঘুনাথ দেখিলেন কি যে, নিতাইএর শরীর হইতে সূর্য্যের ন্যায় তেজ নির্গত হইতেছে, কিন্তু সে শোভা স্নিগ্ধ—মধুর। রঘুনাথ দেখিয়া বিমোহিত হইলেন এবং দূর হইতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। নিকটে একজন ভক্ত ছিলেন, তিনি রঘুনাথকে দেখাইয়া কহিলেন—"ঐ রঘুনাথ আসিয়াছে।"

"শুনি—প্রভু কহে, চোরা দিলি দরশন।
আয় আয় আজি তোর, করিব দণ্ডন॥"

রঘুনাথ ধনীর সন্তান, তাঁহার অনুরাগের কথা তখন দেশে রাষ্ট্র হইয়াছে। বিশেষ নিতাই চাঁদ অন্তর্যামী, তিনি রঘুর মনের কথা জানেন; তাহাতে রঘুনাথের প্রতি তাঁহার কৃপা হইয়াছে। এই জন্যই অতি প্রীতিতে তিনি রঘুনাথকে "চোরা" এই সম্বোধনটী করিলেন। *

নিতাই চাঁদের এই প্রীতি-সম্বোধনে রঘুনাথ গলিয়া পড়িলেন; কিন্তু তিনি নিকটে গেলেন না, ভাবিলেন—"আমি প্রভুর স্পর্শের অযোগ্য; আমি বিষয়ী, আমি তাঁহার নিকট যাইব না।" নিতাই চন্দ্র বড় কৌতুকী, তিনি রঘুনাথকে টানিয়া নিকটে আনিলেন। এবং তাঁহার মস্তকে পদার্পণ পূর্ব্বক কহিলেন—

---

* 'আমাদের অজ্ঞাতেই আমাদের প্রেম প্রাপ্ত হইয়াছে।' এই অভিপ্রায়।

"নিকটে না আইস মোর, ভাগ দূরে দূরে।
আজি লাগ পাইয়াছোঁ, দণ্ডিমু তোমারে॥
দধি চিড়া ভালমতে, খাওয়াও মোরগণে।"
শুনিয়া আনন্দ হৈল, রঘুনাথের মনে॥"
(শ্রীচরিতামৃতে।)

তাঁহার প্রতি এই অভাবিত অপরিমিত করুণা দর্শনে রঘুনাথের মনে অশেষ আনন্দ উপজাত হইল। তিনি তাড়াতাড়ি করিয়া দধি, চিড়া, নানাবিধ সন্দেশ, দুগ্ধ, ও চিনি ইত্যাদি, এবং বহুল পরিমাণে মৃৎপাত্র আনাইলেন। মহা মহোৎসব আরম্ভ হইল, এবং সেই উপলক্ষে অসংখ্য ভিন্ন লোক ও অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও উপস্থিত হইয়া প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে লিখিত আছে যে, যাহারা শুধু কৌতুক দেখিতে গ্রামান্তর হইতে আসিয়াছিল, তাহারাও দধি চিড়া ও কদলী প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া গিয়াছিল। আরও লিখিত আছে যে—

"মহোৎসব শুনি পসারী, নানাগ্রাম হৈতে।
চিড়া দধি কলা সন্দেশ, আনিল বেচিতে॥
যত দ্রব্য লইয়া আইসে, সব মূল্যে লয়।
তারি দ্রব্য মূল্য দিয়া, তাহারে খাওয়ায়॥"

এইরূপে সে মহোৎসবে এত লোক-সংঘটন হইয়াছিল যে, গঙ্গা-তীরে—সেই বিস্তৃত ক্ষেত্রে—বসিবার স্থানের অভাব হওয়ায় অনেকে দাঁড়াইয়াছিল। তখন কাজে কাজেই—

"তীরে স্থান না পাইয়া, আর কত জন।
জলে নামি করে, দধি চিপিটক ভক্ষণ॥"

এই রূপে দয়াল নিতাই রঘুনাথকে অযাচিত রূপে করুণা করেন। নিতাইএর ব্যবহারই ঐরূপ। এই উৎসবে (নিতাইর ধ্যানে) আকৃষ্ট হইয়া স্বয়ং মহাপ্রভু আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

এইরূপে উৎসব সমাপ্তির সহিত দিবা অবসান হইল। তখন রাঘব পণ্ডিত নামে কোন ভক্ত সগণ নিতাই চাঁদকে আপনার বাড়ী লইয়া গেলেন। আমাদের রঘুনাথকেও কাজেই তথায় যাইতে হইল।

পাণিহাটীতে রাঘব পণ্ডিতের বাড়ীতেই নিত্যানন্দের কীর্ত্তনানন্দ হইত। সে কীর্ত্তনের উপমা নাই। পাঠক মহাশয় চৈতন্য-ভাগবতের উদ্ধৃতাংশে তাহার আভাস পাইয়াছেন। উহা রাঘবের বাড়ীরই কীর্ত্তন।

সংকীর্ত্তনান্তে সকলে প্রসাদ পাইতে বসিলেন। রঘুনাথকেও বসিতে বলা হইল, কিন্তু তিনি বসিলেন না। তাঁহার ইচ্ছা যে, ভক্তগণের ভোজনাবশেষ প্রাপ্ত হন। এই পরম বস্তুর মাহাত্ম্য অসীম।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলেন—

"ভক্ত-পদ-ধূলি, আর ভক্ত-পদ জল।
ভক্ত-ভুক্ত-শেষ, এই তিন মহাবল॥
এই তিন সেবা হৈতে, কৃষ্ণ-প্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্ব শাস্ত্রে, ফুকারিয়া কয়॥"

তথাহি শাস্ত্রং—

"তুষ্টাবিষ্টবিপাশঃ স্যাদ্ভক্তপাদরজাশ্রয়াৎ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো ভক্তানাং চরণামৃতাৎ॥"

(ইতি আগমে।)

ভবিষ্যে চ—

"সর্ব্বপাপং ক্ষয়ং যান্তি বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট-ভোজনাৎ।"

পুনস্তত্রৈব,—

"সৎপাদরজোভিষিক্তং শ্রদ্ধান্বিত ভবেদ্ যদি।
ভক্ষণে প্রেমভক্তিশ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥"

অতএব রঘুনাথ আহারে বসিলেন না, এবং অবশেষে কেবল ভক্তের নহে,—স্বয়ং প্রভুর শেষ পাত্র প্রাপ্ত হইয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন।

রাত্রি প্রভাতে প্রভু নিজগণ সহ পুনর্ব্বার সেই বৃক্ষমূলে গিয়া বসিলেন ও রঘুনাথকে নিকটে আনিয়া বলিলেন, "রঘু, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, তোমার এই মহোৎসবে প্রভুর আবির্ভাব হইয়াছিল, তিনি তোমাকে কৃপা করিয়া গ্রহণ করিবেন। অতএব তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়ী যাও; শীঘ্রই তুমি প্রভুর শ্রীচরণে আশ্রয় পাইবে।"

রহস্যেতে রঘুনাথের দণ্ড, এই জন্য ঐ মহোৎসবকে "দণ্ড মহোৎসব" কহিয়া থাকে।

শ্রীক্ষেত্র-যাত্রা।

পাণিহাটী হইতে রঘুনাথ বাড়ী আসিলেন। নিতাইর কৃপায় রঘু প্রেমে ঢল ঢল করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার চক্ষের উপর গৌর নিতাইর লীলাবলী ঝলকে ঝলকে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। রঘুনাথ সেই হইতে আর বাড়ীর ভিতরে গেলেন না,

বাহিরে—দুর্গা মণ্ডপে রহিলেন; এবং প্রাণের উদ্বেগে, বিরহের যন্ত্রণায়,'হা গৌরাঙ্গ, হা গৌরাঙ্গ করিতে লাগিলেন। যথা—

কোথা মোর দয়াল গৌরাঙ্গ।
তুমি বিনে হায় হায়, এ হৃদি ফাটিয়া যায়,
কবে নাথ পাব তব সঙ্গ॥
নিজ গুণে যদি মোরে, বান্ধিয়া কৃপার ডোরে,
লয়ে যাও চরণ সদনে।
তবে আশা পূর্ণ হয়, হৃদে শান্তি উপজয়,
তবে দাস বাঁচিবে হে প্রাণে॥
হা হা প্রভো দয়ার সাগর।
প্রাণ যায়, প্রাণ যায়, করিব হে কি উপায়,
যন্ত্রণায় ফাটিছে অন্তর॥
একালে দয়াল হরি, তুমি কৃপা মাত্র করি,
অধীনের বাসনাটী পূর॥
এ দীন বৈষ্ণব দাস, বলে বাক্য আশ্বাস,
অচিরে পাইবে চিত্ত গোর॥

পলাইবার যো নাই; চতুর্দ্দিকে প্রহরীগণ সর্ব্বদা সাবধানে থাকে। এক দিন সে সুবিধা কিন্তু আপনি আসিয়া জুটিল। যিনি ভক্তের ক্রন্দনে স্বর্গ-সিংহাসনেও স্থির থাকিতে পারেন না, যিনি ভক্তের জন্য কত অসাধ্য সাধন করিয়া থাকেন, যিনি ভক্তাহ্বানে একদা স্ফটিক-স্তম্ভে আবির্ভূত হইয়া ছিলেন, যিনি কেবল ভক্ত মাত্রেরই প্রেমাধীন, সেই দয়ালু প্রভু রঘুনাথের কাতর প্রার্থনায় অস্থির হইয়া উপায় করিয়া দিলেন।

রঘুনাথের গুরু যদুনন্দনাচার্য্য। * কোন কারণে আচার্য্যের পূজারী চলিয়া গিয়াছিলেন। এক দিন রাত্রি-শেষে আচার্য্য ঠাকুর আসিয়া বলিলেন, "রঘুনাথ! আমার পূজারী চলিয়া গিয়াছে, আর পূজার জন্য আপাততঃ কোন ব্রাহ্মণও পাইতেছি না, এখন যদি তুমি ইহাকে বুঝাইয়া আমার কাছে পাঠাইয়া দাও, তবেই হয়।"

রঘুনাথ গুরুর সঙ্গে চলিলেন; কতক দূর গিয়া গুরুদেবকে কহিলেন, "প্রভো, আপনি ঘরে যান, আমি পূজারী ঠাকুরকে পাঠাইয়া দিব।" রঘুনাথ এই ছলে গুরুর নিকট হইতে গমনের আজ্ঞা লইয়া প্রথমে সেই পূজারীকে পাঠাইয়া দিলেন, এবং তৎপরে আর বাড়ীর দিকে না আসিয়া পলাইলেন। এইরূপে রঘুনাথ—

"দারা গৃহ সম্পদ, নিজ রাজ্য অধিপদ,
মল প্রায় সকল ত্যজিল।"

রাত্রে প্রহরীরা নিদ্রিত হইয়াছিল, তাহারা এ সংবাদ জানিল না।

এখানে আপনে বলিতে পারেন যে, রঘুনাথের এ বড় অন্যায়, পিতা মাতা ও নব বধূটীকে ফেলিয়া যাওয়া বড় অন্যায়। কিন্তু রঘুনাথ কি যথার্থই বড় দোষী?

আপনে রঘুনাথকে দেখিলেই সুখী। এই জন্য তাঁহাকে

---

* "শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য, অদ্বৈতের শাখা।
তাঁর শাখা উপশাখার, নাহি হয় লেখা॥
বাসুদেব দত্তের তিঁহো, কৃপার ভাজন।
সর্ব্ব ভাবে আশ্রিয়াছে, চৈতন্য-চরণ॥"

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত।

রাখিতে চান, এবং তাঁহার পায়ে সুদৃঢ় শৃঙ্খল পরাইয়া দেন। আর রঘুনাথ প্রাণের যন্ত্রণায় সে শৃঙ্খল মোচন করিতে তাঁহাকে দূষেন, একি উচিত? সত্য বটে—পিতা মাতা খুব বড় বস্তু, কিন্তু পিতা মাতা হইতেও বড় বস্তু ধর্ম্ম। তার পর নবীনা ভার্য্যা? বলিতে পারেন যে, রঘুনাথের যদি পলাইবারই মন ছিল, তবে তিনি বিবাহ করিলেন কেন? কিন্তু এ বিবাহে কি রঘুর সম্মতি কি একটু সুখ ছিল? তিনি প্রথমাবধিই জানিতেন যে, ইহা একটী সুদৃঢ়তম নিগড়। আর তাহাতেই তিনি এ নিগড়ের আয়ত্তাধীনে আসেন নাই। * এখানে রঘুনাথের দোষ কি? এরূপ না করিলে কি তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গ প্রাপ্ত হইতে পারিতেন? যদি একটু ত্যাগ স্বীকার (?) করিয়া শ্রীভগবানকে পাওয়া যায়, তবে কে তাহা না করে? তবে রঘুনাথই বা কেন তাহা না করিবেন? অতএব রঘুনাথকে দোষ দেওয়া কি ভাল?

সে যাহা হউক, রঘুনাথ দিক পরিবর্ত্তন না করিয়া পিঞ্জর-মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় ঊর্দ্ধশ্বাসে পূর্ব্বমুখেই চলিলেন ও পশ্চাৎ ফিরিয়া ক্ষণে ক্ষণে দেখিতে লাগিলেন যে, কেহ তাঁহার খোঁজে আসিতেছে কি না। নিজের সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টি মাত্র নাই—পায়ে কত উছট্ লাগিতেছে, কত বার পদস্খলন হইতেছে, কত বার আছাড় খাইয়া পড়িয়া যাইতেছেন, সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, কেবল "হে নিতাই, হে চৈতন্য" এই মাত্র বলিতেছেন, আর দৌড়িতেছেন। তখন

---

* "সুন্দরী যুবতী নারী, ভূষণে ভূষিত।
বিষ তুল্য মানে তাহা, হেরিয়া কম্পিত॥"

ভক্তমাল।

তাঁহার মন ভয় এবং উদ্বেগে যুগপৎ আন্দোলিত, তিনি এ সময়ে সেই অনন্ত-শরণ শ্রীগৌরাঙ্গকে এক-চিত্তে ডাকিতে লাগিলেন।

হে গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ চাঁদ।
উদ্ধার করহ মোরে, কৃপা বিতরণ করে,
এইবার এড়ি যেন ফাঁদ॥
হে গৌরাঙ্গ পতিতের নাথ।
হে দয়াল নিত্যানন্দ, হে প্রভুর ভক্ত-বৃন্দ,
কর সবে কৃপা দৃষ্টিপাত॥
হে গৌরাঙ্গ দয়াময়, না হইও নিরদয়,
পাই যেন চরণ-দর্শন।
এ দীন বৈষ্ণব দাস, বলে বাক্য আশ্বাস,
দেখা পাবে—ভাব কি কারণ॥

এইরূপে রঘুনাথ পথ ছাড়িয়া বন-পথে চলিতে চলিতে সন্ধ্যা-কালে এক গোয়ালার বাথানে উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থান তাঁহার বাড়ী হইতে ১৫ পনের ক্রোশ দূরে অবস্থিত। গোয়ালা তাঁহাকে পরিশ্রান্ত দেখিয়া কিছু দুগ্ধ আনিয়া দিলে তিনি সে দিন সেই দুগ্ধ মাত্রই পান করিয়া রহিলেন।

এ দিকে রঘুনাথকে না দেখিয়া আত্মীয় স্বজন বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। রঘুনাথের পূর্ব্ব আচরণে তাঁহারা অক্লেশেই বুঝিতে পারিলেন যে, রঘু পলাইয়াছেন। এরূপ মনে হওয়ায় তাঁহাদের শোকের আর পরিসীমা থাকিল না। রঘুনাথের জননী ভূমে বিলুণ্ঠিতা হইতে লাগিলেন। আর লোকললামভূতা সেই লাবণ্যময়ী বালিকাটী, যিনি কেবল স্বামী-দর্শন ভিন্ন অন্য কোন সুখ বুঝেন না, যিনি তাহাতেই মাত্র পরিতুষ্টা থাকিতেন, তাঁহার

সেই এক মাত্র সুখেও বিধাতা বাদ সাধিলেন ; সে অবলা বালার বিলাপে পাষাণও গলিয়া গেল।

এখানে অগ্রে একটী কথা বলিয়া ফেলি। শ্রীভগবানের গুণাবলীর মধ্যে একটী গুণ এই যে, তিনি কাহারও কাছে ঋণী থাকেন না। বিশেষ তিনি কাহাকেও চিরদুঃখে নিমজ্জিত করিয়া রাখেন না। শ্রীগৌরাঙ্গের কারণে রঘুনাথের পরিবার অনাথ—সদা বিষাদাচ্ছন্ন, এমন কথাও পরে কেহ বলিতে পারে নাই। এই যে রঘুনাথের জননী, যিনি একদা ত্রিজগৎ শূন্য বোধ করিয়াছিলেন, পরে তাঁহার বধূই তদীয় পুত্রস্নেহের অধিকারিণী হইয়াছিলেন।—বধূকে বুকে করিয়াই তিনি রঘুর বিরহ-জ্বালা ভুলিতেন। আর রঘুনাথ যে কমলাননা উন্মুখ যৌবনা সুশীলা ভার্য্যাটী এবং অতুল সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, ইহার পর এই ঘটনাটী যখন সেই দুঃখিনী রমণী (রঘুনাথের স্ত্রী) ভাবিতেন, তখন তিনি এক অনুপম ভাবে বিভাবিত হইয়া পড়িতেন। যখন ভাবিতেন—ভগবানের জন্য, শ্রীগৌরাঙ্গের জন্য, তাঁহার স্বামী তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন, তখন তাঁহার প্রতি অঙ্গ দিয়া প্রেমরাশি ফুটিয়া পড়িত, ভগবৎ প্রেমে তিনি তখন সমস্ত ভুলিয়া গিয়া বিবশা ও স্তম্ভিতা হইয়া রহিতেন। অবশেষে এই চিন্তাই তাঁহার সুখের একমাত্র হেতু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আবার বধূর এই প্রেমানন্দ সন্দর্শনে শ্বাশুড়ী প্রহর্ষিতা—পরিতুষ্টা হইতেন।

সে যাহা হউক, রঘুনাথের নিদারুণ পলায়ন-কাহিনী যখন গুরু যদুনন্দনাচার্য্য শুনিলেন, তখন তিনি রাত্রের ঘটনা ভাবিয়া লজ্জিত ও বিষাদিত হইলেন। কিন্তু, "রঘু ভালই করিয়াছে," ইহা পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইল। তখন তিনি ঘটনা কহিবার ও

শোকাতুরদিগকে সান্ত্বনা করিবার জন্য শীঘ্রই রঘুনাথের বাড়ী আসিলেন। তিনি উপস্থিত হইলে হিরণ্যদাস প্রভৃতি জিজ্ঞাসা-ক্রমে তাঁহার নিকট হইতে সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের অনুমানই যথার্থ হইয়াছে। তখন রঘু-নাথের অনুসন্ধানে ১০ দশ জন লোক প্রেরিত হইল।

ঐ সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ নীলাচল (মহাপ্রভু-দর্শনে) যাইতেছিলেন। গোবর্দ্ধন দাসের প্রেরিত লোক ঝাকরা নামক স্থানে আসিয়া ভক্তগণের সঙ্গ পাইল। তাহারা গোবর্দ্ধনের প্রদত্ত পত্র প্রদানান্তর রঘুনাথের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, শিবানন্দ সেন (যিনি অধ্যক্ষতা করিয়া সমস্ত ভক্তদিগকে নীলাচল লইয়া যাইতেন, তিনি) উত্তর করিলেন, "রঘুনাথ এখানে আসেন নাই।" এই কথা শুনিয়া লোকেরা ফিরিয়া আসিল।

সম্মিলন।

এদিকে রঘুনাথ অতি প্রত্যূষে উঠিয়া পূর্ব্ব দিক ত্যাগ করতঃ দক্ষিণ মুখে চলিলেন। সেই পূর্ব্ববৎ ঊর্দ্ধশ্বাসে "শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গ" বলিতে বলিতে চলিলেন। যথা ভক্তমালে—

"অতি উৎকণ্ঠিত মন, উন্মত্তের প্রায়।
দিগ্বিদিক ফিরি বুলে, গ্রাম না তাকায়॥
জল জঙ্গল তৃণ, কণ্টক শর্করা।
নাহি মানে, ধায় মাত্র বাতুলের পারা॥"

এইরূপে যাইতে যাইতে—

"বার দিনে উত্তরিল, শ্রীপুরুষোত্তম।
তার মধ্যে তিন সন্ধ্যা, আহার সে নাম॥"

এইরূপে ১৯ উনিশ বৎসর বয়সের বালক রঘুনাথ ১৪৩৯ শকে নীলাচলে পৌছিলেন। যখন তিনি প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপাদিগণ সহ বসিয়াছিলেন। রঘুনাথ দূর হইতেই প্রণিপাত করিলেন। বাসুদেব দত্তের কনিষ্ঠ মুকুন্দ দত্ত প্রভুর নিকটে ছিলেন। তিনি রঘুনাথকে দেখিয়াই কহিলেন, "ঐ রঘুনাথ আসিয়াছে।" রঘুনাথ কৃতাঞ্জলি সহকারে বলিতে লাগিলেন—

"হে নাথ, হে প্রভো, ওহে করুণানিধান।
কৃপা কর, শ্রীচরণে লইনু শরণ॥
অনাথ অধম আমি, অতি হীন দীন।
কৃপাবলোকন কর, জানিয়া অধীন॥"

(ভক্তমাল।)

এই প্রকার বিবিধ দৈন্য প্রকাশ করিয়া রঘুনাথ ভূমে গড়াগড়ি দিতে লাগিলে প্রভু ঈষদ্ধাস্য সহকারে তাঁহাকে ভূমি হইতে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। তৎপর রঘুনাথ স্বরূপাদি সকলকে প্রণাম করিলে তাঁহারা স্নেহ সহকারে আলিঙ্গন করিলেন। অতঃপর প্রভু, দুই একটী কথা বলিয়া রঘুনাথকে স্বরূপ গোস্বামীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। সে কি কথা, তাহা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের ভাষায় বলিতেছি। যথা—

"প্রভু কহে, কৃষ্ণ-কৃপা, বলিষ্ঠ সবা হৈতে।
তোমাকে কাড়িল, বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্ত হৈতে॥

রঘুনাথ কহে, মনে কৃষ্ণ নাহি জানি।
তোমার কৃপায় কাড়িল আমা, এই আমি মানি।
প্রভু কহে, তোমার পিতা জেঠা দুই জনে।
চক্রবর্ত্তী* সম্বন্ধে আমি, আজ্ঞা করি মানে॥
চক্রবর্ত্তীর হয় দোঁহে, ভ্রাতৃ রূপ দাস।
অতএব আমি তাঁরে, করি পরিহাস॥
ইহার বাপ জেঠা, বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্তের কীড়া।
সুখ করি মানে, বিষম বিষয়ের মহাপীড়া॥
যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে, ব্রাহ্মণের সহায়।
শুদ্ধ বৈষ্ণব নহে, হয় বৈষ্ণবের প্রায়॥
তথাপি বিষয়ের স্বভাব, করে মহা অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায়, যাতে হয় ভববন্ধ॥
হেন বিষয় হৈতে, কৃষ্ণ উদ্ধারিল তোমা।
কহনে না যায়, কৃষ্ণ-কৃপার মহিমা॥"

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর প্রভু রঘুনাথকে স্বরূপের হস্তে সমর্পণ † করিয়া কহিলেন, "ইহাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম, ইহার

---

* চক্রবর্ত্তী—নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মাতামহ।

† আচার্য্য গোসাঞীর শিষ্য শ্রীযদুনন্দন।
রঘুনাথ তার শিষ্য, আত্ম সমর্পণ॥
বিষয় ছাড়িলা, নিত্যানন্দ কৃপা বলে।
প্রভুর দর্শন কৈল, যাই নীলাচলে॥"
"প্রভু তারে সমর্পিলা, স্বরূপের স্থানে।
শিক্ষা করাইল তারে, কায় বাক্য মনে॥
কারণ বুঝিল মাত্র, গৌরাঙ্গ আপনে।
কেন হেন কার্য্য করে? বুঝে কোন্ জনে॥

সম্বন্ধে যা' কিছু করিতে হয়—তুমি করিবে," এবং শুরুদত্ত ভৃত্য গোবিন্দকে কহিলেন—"পথে রঘুর অনেক উপবাস হইয়াছে, তুমি ইহাকে কএক দিন ভাল করে খাওয়াও।" ইহার পর তিনি মধ্যাহ্ন-ভোজনে গমন করিলে, রঘুনাথ সমুদ্র-স্নান করতঃ জগন্নাথ-দর্শন করিয়া তবে প্রসাদ পাইলেন। রঘুনাথের প্রতি প্রভুর ঈদৃশ কৃপাবলোকনে ভক্তগণ রঘুনাথের ভাগ্য প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

মহাপ্রভুর গণে রঘুনাথ নামে ইতিপূর্ব্বে আর দুই জন ভক্ত ছিলেন; এই নবাগত রঘুনাথকে লইয়া এক্ষণে তিন জন হওয়া প্রযুক্ত ইনি "স্বরূপের রঘু" বলিয়া অভিহিত হইলেন।

—•—

স্বরূপের আশ্রয়ে।

এইরূপে রঘুনাথ প্রভুর নিকট আসিয়া অনেক দিনের পর শান্তি পাইলেন, অনেক দিনের পর তিনি হাঁফ ছাড়িয়া আরাম পাইলেন। সে সম্পদ এবং আত্মীয় বন্ধন হইতে যে আসিতে পারিয়াছেন, তাহাতে তিনি অতি মাত্র সুখী হইলেন, আর এই

শৃঙ্গার ললিত রসে, অধিক নিপুণ।
দিবানিশি সহায় করে, ললিতার গুণ॥
পূর্ব্ব যাক্য সিদ্ধ আছে, বুঝে কোন জনা।
স্বরূপের প্রিয় বলি, করেন করুণা॥"

(প্রেমবিলাস।)

তাবে অনেক দিনের পরে তিনি একটী শ্লোকে প্রকাশ করেন। যথা চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে—

"মহাসম্পদ্দারাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া,
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাংন্যস্যমুদিতঃ।
উরোগুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধনশিলাং,
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি॥"

ইহার অনুবাদ (শ্রীপ্রভু নবদ্বীপ চন্দ্র গোস্বামী কৃত)—

"আমি অভাজন জন, বেষ্টিত সম্পদ ধন,
ত্রিতাপ সে বনে দাবানল।
স্বরূপে আশ্রয় দিয়ে, করুণাতে উদ্ধারিয়ে,
প্রকাশিল আনন্দ প্রবল॥
বক্ষে ধৃত গুঞ্জাহার, গোবর্দ্ধন শিলা আর,
সঁপিলেন দয়া করি মোরে।
এ হেন দয়ার নিধি, হৃদয়ে উদয় যদি,
সে আনন্দ ধৈর্য্য কেবা ধরে॥
আরে মোর সোণার গৌর প্রভু।
হৃদয়ে উদয় হৈয়া, মাতায় আমার হিয়া,
ভুলিতে নারিব আর কভু॥"

এই যে শিলা গুঞ্জাহার, ইহার কথা একটু পরে নিবেদন করিব।

রঘুনাথ স্বরূপের আশ্রয়ে মনের আনন্দে নীলাচলে বাস করিতে লাগিলেন। স্বরূপের ন্যায় প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত কেহই ছিলেন না; প্রভুর মনের ভাব একমাত্র স্বরূপই বুঝিতেন। প্রভুর প্রতি তাঁহার প্রীতির একশেষ ছিল। যথন প্রভু সন্ন্যাস করেন, তখন স্বরূপ

(ইঁহার পূর্ব্ব নাম পুরুষোত্তম) সেই নিদারুণ বার্ত্তা শ্রবণে উন্মত্তবৎ দেশে দেশে ফিরিতে লাগিলেন, অবশেষে বিষম বিরহে আপনিও সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। কিন্তু প্রভুর নিকটে গেলেন না,—অভিমানে কাশীবাস করিতে লাগিলেন। পরে প্রভু যখন দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করিয়া নীলাচল আসিলেন, তখন তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, সেই সংবাদ শুনিবা মাত্রই দ্রুতপদে নীলাচলে উপস্থিত ও প্রভুর সহিত পুনর্ম্মিলিত হন।

নিম্নের শ্লোকটী স্বরূপের—

"রাধাকৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতি হ্লাদিনী শক্তিরস্মা—
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকট মধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং,
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং॥"

ভাবার্থ—কৃষ্ণ-প্রেমের বিকৃতিরূপ হ্লাদিনী শক্তির নাম রাধা। এই হেতু স্বরূপতঃ তাঁহারা একাত্মা হইয়াও বিলাস-বাসনায় পুরাকাল হইতে দেহ-ভেদ স্বীকার করেন। সম্প্রতি সেই দুই জন একত্ব প্রাপ্ত হইয়া শ্রীচৈতন্য নামে প্রকট হইয়াছেন। অতএব রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণ-স্বরূপ সেই চৈতন্য দেবকে প্রণাম করি।

ফলতঃ, স্বরূপের ন্যায় মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত আর কেহই ছিলেন না।

এ হেন স্বরূপের আশ্রয় পাইয়া ও তাঁহার নিকট হইতে বিবিধ নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইয়া রঘুনাথ মনের আনন্দে নীলাচলে বাস করিতে লাগিলেন। অতএব স্বরূপ রঘুনাথের শিক্ষাগুরু। *

* প্রেমবিলাসোদ্ধৃত পূর্ব্ব টীকা দ্রষ্টব্য।

রঘুনাথের গৃহবাস কালে সুখ ছিল না, পরে দেখিবেন—বৃন্দাবন বাসকালেও তাঁহার মনে সুখ নাই; সুতরাং তিনি নীলাচলে যে কয়েক বৎসর ছিলেন,—মনের সুখেই ছিলেন।

রঘুনাথের বৈরাগ্য,—তাঁহার মানসিক সেবা।

রঘুনাথ জগন্নাথ দর্শনান্তর প্রভুর অবশিষ্ট ভোজন ও নাম গ্রহণ করেন। এইরূপ পাঁচ দিবস গত হইলে রঘুনাথ আর খাইতে আসিলেন না, এখন রাত্রি দশ দণ্ডের পর জগন্নাথের অঞ্জলি দর্শনান্তর সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া থাকেন, তখন কেহ কিছু দিলে তবে খান, নতুবা উপবাস করেন। গোবিন্দ এই কথা প্রভুকে জানাইলেন। উহা শুনিয়া প্রভু বড় সন্তুষ্ট হইলেন এবং এই উপলক্ষে কৃপা করিয়া বৈষ্ণবদিগকে নিম্নোদ্ধৃত উপদেশ প্রদান করিলেন। যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে—

"ভাল কৈলা, বৈরাগির ধর্ম্ম আচরিলা।
বৈরাগী করিবে সদা, নাম সঙ্কীর্ত্তন।
মাগিঞা খাইঞা করে, জীবন রক্ষণ॥
বৈরাগী হইয়া যেই, করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধ নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
বৈরাগী হইয়া করে, জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায়, তার রসে হয় বশ॥

বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম সঙ্কীর্ত্তন।
শাক পত্র ফলে মুলে, উদর ভরণ॥
জিহ্বার লালসে যেই, ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ, কৃষ্ণ নাহি পায়॥"

অনন্তর এক দিন রঘুনাথ স্বরূপের দ্বারা প্রভুকে কহিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহার কর্ত্তব্য কি সেই সম্বন্ধে প্রভু যেন শ্রীমুখে কিছু বলিয়া দেন। ইহা শুনিয়া প্রভু হাসিয়া হাসিয়া কহিলেন, "স্বরূপ তোমায় সব বলিবে, স্বরূপের ন্যায় আমিই অত জানি না; তথাপি আমার বাক্যে শ্রদ্ধাধিক্য হেতু কহিতেছি—

"গ্রাম্য বার্ত্তা না কহিবে, গ্রাম্য বার্ত্তা না শুনিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ, কৃষ্ণ নাম সদা লবে।
ব্রজে রাধা কৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥"

তথাহি শ্রীমহাপ্রভু-বাক্যং—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

(শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত।)

হায়! বর্ত্তমানে এই সুদুর্লভ উপদেশাবলী সম্যক রক্ষিত হয় না, হইলে বৈষ্ণব সমাজের এত দুর্গতি হইত না। এই অমূল্য উপদেশগুলি যে শুধু ভেকাশ্রিত বৈষ্ণবগণের পক্ষে, তাহা নহে; ইহাই বৈষ্ণব ধর্ম্মের মুল সূত্র।

এইরূপে রঘুনাথ স্বরূপের সঙ্গে থাকিয়া মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা করিতে লাগিলেন। ইহার কিছু দিন পরেই গৌড়ের ভক্ত-

গণ আসিয়া পৌঁছিলে, রঘুনাথ অদ্বৈতাদি সকলকে প্রণাম করিলেন; এবং রঘুনাথের পিতা তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য যে প্রকার লোক ও পত্র পাঠাইয়া ছিলেন, শিবানন্দ সেন তাহা তাঁহাকে কহিলেন।

গৌড়ের ভক্তগণ বর্ষার চারি মাস নীলাচলে থাকিয়া দেশে ফিরিয়া গেলেন। তখন রঘুনাথের পিতা লোক দ্বারা শিবানন্দের নিকট হইতে পুত্রের সমস্ত সংবাদ শুনিলেন। * রঘুনাথের কঠোর বৈরাগ্যের কথা শুনিয়া, বলা বাহুল্য যে, তাঁহার পিতা-মাতার মনে দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল। রঘুনাথের পিতা পর বর্ষে এক

---

* গোবর্দ্ধন-প্রেরিত লোক ও শিবানন্দ সেনের কথাবার্ত্তা।

যথা—প্রেমদাসের অনুবাদিত চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে—

"সমাগত লোক বলে, শুন মহাশয়।
রঘুনাথ দাস সনে, আ'ছে পরিচয়?
সেন বলে, "পরিচয় কি জিজ্ঞাস আর?
প্রাণাধিক প্রিয়, রঘুনাথ মো সবার।"
"তাহার বৈরাগ্য রীতি, সৌশীল্য ভজন।
দেখি তারে প্রীতি করে, সর্ব্ব ভক্তগণ॥
শ্রীঅদ্বৈত গোসাঞির, বাসুদেব ছাত্র।
যদুনন্দন আচার্য্য, তাহার কৃপা-পাত্র॥
তার শিষ্য রঘুনাথ, প্রাণাধিক মোর।
শ্রীচৈতন্য-কৃপামৃতে, সিক্ত স্নিগ্ধতর।
বৈরাগ্যের নিধি দেখি, গৌর ভগবান।
অনুগত করি দিল, স্বরূপের স্থান॥"
"সাধন সেবন আদি, অন্যে নাহি যাহা।
তুল্য রঘুর প্রেম, কি কহিব তাহা।" ইত্যাদি।

ব্রাহ্মণ দ্বারা চারি শত টাকা পাঠাইয়া দেন। রঘুনাথ কিন্তু টাকা গ্রহণ করিলেন না। তিনি টাকা দিয়া কি করিবেন? আর টাকায় প্রতি আসক্তি থাকিলে কি বিংশতি লক্ষের স্বামীত্ব ত্যাগ করিতে পারিতেন?

রঘুনাথ টাকা লইলেন না, সে ব্রাহ্মণও কিন্তু টাকা না দিয়া যান না; সুতরাং কি করেন? অগত্যা ঐ টাকা প্রভুর সেবায় ব্যয় করিতে মনস্থ করিয়া মাসে দুই বার প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। মাসে দুই দিন খাওয়াইতে আট পণ কড়ি লাগিত, ব্রাহ্মণের নিকট হইতে তাহাই মাত্র গ্রহণ করিতেন; বাকি টাকা ব্রাহ্মণের কাছে থাকিত। কিছু দিন পরে রঘুনাথ নিমন্ত্রণ বন্ধ করিয়া দিলেন। তাহাতে প্রভু স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, রঘুনাথ বিষয়ীর অর্থে ক্রীত দ্রব্যে তাঁহার সেবা করা অন্যায় ভাবিয়া নিমন্ত্রণ বন্ধ করিয়াছেন।

"শুনি—মহাপ্রভু হাসি কহিতে লাগিলা।
বিষয়ীর অন্ন খাইলে, মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে, নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥
ইহার সঙ্কোচে আমি, এত দিন নিল।
ভাল হৈল, জানিয়া আপনে ছাড়ি দিল॥"

(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।)

অনন্তর, খাওয়ার জন্য সিংহ-দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকা রঘুনাথের ভাল লাগিল না। তিনি উহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক "ছত্রে" গিয়া মধ্যাহ্নে মাত্র ভিক্ষা করিয়া খাইতে লাগিলেন। মহাপ্রভু ইহাও শুনিলেন, শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন—"রঘু ভালই করেছে, সিংহ-দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকা বেশ্যার রীতি; ইহাতে 'ঐ এক জন

আসিতেছে, এ দিবে, ঐ অপর ব্যক্তি আসিতেছেন, উনি দিবেন," মনে ইত্যাকার বিবিধ সঙ্কল্প জন্মে।" ইহা কহিয়া প্রভু প্রীতি-সহকারে তাঁহাকে শ্রীগোবর্দ্ধন গিরির এক খণ্ড শিলা ও এক ছড়া গুঞ্জামালা (যাহা তিন বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাকে শঙ্করানন্দ সরস্বতী দিয়াছিলেন, তাহা) দিয়া কহিলেন, "এই শিলাকে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ জানিয়া তুলসী মঞ্জরী দ্বারা সাত্ত্বিক ভাবে পূজা কর।" রঘুনাথ শিলা ও মালা পাইয়া বড় আনন্দিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন—"এ শিলা দিয়া প্রভু আমাকে গোবর্দ্ধনে এবং মালা দিয়া রাধা কুণ্ডে বাসের অনুমতি দিলেন। এই নিদেশ অনুসারে ভবিষ্যতে তিনি গোবর্দ্ধনে ও রাধাকুণ্ডে বাস করিয়াছিলেন।

কিছুদিন পরে রঘুনাথ ছত্রে ভিক্ষা করাও ত্যাগ করিলেন। ভাবিলেন—"আমি যে ভিক্ষা আনি, তাহাতে অন্য এক জনের খাওয়া হইতে পারে।" অতএব তিনি ইহা ত্যাগ করিয়া অন্য এক নিয়ম করিলেন।

"অনন্ত রঘুনাথের গুণ, কে করিবে লেখা।
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাথরের রেখা॥
সাড়ে সাত প্রহর যায়, যাঁহার স্মরণে।
আহার নিদ্রা চারি দণ্ড, সেহ নহে কোন দিনে॥
বৈরাগ্যের কথা তার অদ্ভুত কথন।
আজন্ম না দিল, জিহ্বায় রসের স্পর্শন॥
ছিঁড়া কানি কাঁথা বিনা না পরে বসন।
সাবধানে কৈল, প্রভুর আজ্ঞার পালন॥"

(শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত।)

রঘুনাথ নিয়ম করিলেন যে, প্রসাদ-বিক্রেতাদের যে সব প্রসাদ বিক্রয় না হয় বাসি হইয়া গেলে তিন চারি দিন পরে তাহা সিংহ-দ্বারের নিকট এক স্থানে গাভীদিগকে খাইতে দেওয়া হয়, তাহার মধ্যে পঁচা গন্ধে গাভীরাও যাহা না খাইয়া চলিয়া যায় রঘুনাথ তাহাই লইয়া আসিতেন ও ভাল করে জলে ধৌত করিয়া, অম্ল লবণ মিশাইয়া, তবে যে কিছু খাইতেন। স্বরূপ গোস্বামী রঘুনাথের এই অদ্ভুত আচরণ দৃষ্টে বিস্মিত ও বিমোহিত হইলেন, এবং এক দিন চাহিয়া কিছু খাইলেন ও প্রেমানন্দে বলিয়া উঠিলেন—"রঘু, তুমি রোজ রোজ ঐরূপ অমৃত খাও, আর আমাদিগকে দেও না, এ তোমার কেমন প্রকৃতি?" এই সমস্ত কথা প্রভু গোবিন্দের নিকট হইতে শুনিলেন। শুনিয়া ভক্ত-বৎসলের প্রেম-বারিধি উচ্ছসিত হইয়া উঠিল তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না;—কি করিলেন, তাহা নিম্নের পদটীতে প্রকাশিত আছে।

দয়াল গৌরাঙ্গ আমার ভকত-বৎসল।
ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন, এবে সে শচীনন্দন,
ভক্তের ভাবেতে হন কাতর—বিকল॥
স্বরূপের রঘুনাথ, ধুইয়া সে শড়ি ভাত,
প্রতি দিন খায়েন আনন্দে।
এই সব বিবরণ, এক দিন নিবেদন,
প্রভু কাছে করিলা গোবিন্দে॥
শুনয়া দয়াল মোর, হৈয়ে বিগলিত রে,
রঘুনাথ কাছেতে আইলা।
"খাসা বস্তু খাও রঘু, আমায় না দিয়ে রে,"
এত বলি গ্রাস এক লইলা॥

কত না যতনে লক্ষ্মী, রন্ধন করিয়া রে,
যে প্রভুরে খাওয়ায় সতত।
অমৃতের অমৃত জিনি, খাদ্য খাওয়াইতে রে,
লক্ষ্মী দেবী হন সঙ্কুচিত॥
সেই প্রভু দয়াময়, ভাবেতে গলিয়া রে,
শড়ি অন্ন সুখেতে লইলা।
আর গ্রাস লৈতে প্রভু, হায় হায় করিরে,
স্বরূপ সে হাতেতে ধরিলা॥
"ঐছন গলিত অন্ন, তব যোগ্য নহে রে,"
বলিয়া স্বরূপ কাড়ি নিল।
প্রভু কহে, "নিতি আমি নানা অন্ন খাই রে,
কভু ঐছে স্বাদ না পাইল॥"
আমার দয়াল প্রভু, ঐছে কত লীলা রে,
করে আহা স্বানুভাবানন্দে।
এ দীন বৈষ্ণব দাস, সে সব স্মরিয়া রে,
নিরন্তর ঝুরে ঝুরে কান্দে॥

রঘুনাথের নীলাচলাখ্যান এইরূপ। এইরূপ তিনি ষোল বৎসর তথায় অতিবাহিত করেন। এখন রঘুনাথের এই নীলাচল, কাহিনী শেষ হইয়া আসিল। এখানে আর একটী কথা বলে নেই, তার পরেই আমাদিগকে দুঃখ সহকারে নীলাচল হইতে বিদায় লইতে হইবে।

একদা রঘুনাথের জ্বর হইল। জ্বর অন্তে সকলেরই নানাবিধ দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা হয়। এক দিন রাত্রে রঘুনাথেরও তাহাই হইল, আর অমনি তিনি মানসে সেই সব সুস্বাদ দ্রব্য প্রস্তুত (পাক)

করিতে লাগিলেন। সব প্রস্তুত হইয়া গেলে মানসে তাহা প্রভুকে খাওয়াইলেন। রঘুনাথের মনোমত তৃপ্তিকর বিবিধ খাদ্য দ্রব্য প্রভুও বড় তৃপ্তির সহিত খাইলেন, এবং রঘুনাথ আনন্দে অবশেষ পাইলেন। এইরূপে জ্বরের পথ্য হইয়া গেল।

এ গেল মানসিক ব্যাপার; ধ্যাতা এবং ধ্যেয় অন্তর্জগতে যে লীলাই করুন না কেন, বাহ্য-জগৎ তাহার অনুসন্ধান রাখে না,—জানিতে পারে না। কিন্তু ভগবান, যে কোন ছলেই হউক, ভক্ত-মহিমা প্রচারে সদা ব্যস্ত। অতএব চরিতামৃতে এক স্থলে বলিয়াছে,—

"ভক্ত-মহিমা বাড়াইতে, ভক্তে সুখ দিতে।
মহাপ্রভু সম আর, নাহি ত্রিজগতে॥"

অতএব ভক্তের হৃদয়-ধন শচী-নন্দন পর দিন আর খাইতে গেলেন না। পর দিন নিয়মিত সময়ে গোবিন্দ তাঁহাকে খাওয়ার জন্য কহিলেন। প্রভু বলেন—"কালিকার ভোজনে আমার পেট ফুলিয়া গিয়াছে, এখন আর খাইতে পারিব না।" এই কথার মর্ম্ম কেহই বুঝিলেন না। তখন প্রভু বলিলেন—"কল্য রাত্রে স্বরূপের রঘু আমাকে নানাবিধ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট দ্রব্য খাওয়াইয়াছে, তাহাতে আজ আমার আর খাইতে রুচি হইতেছে না।" ভক্তগণ এ কথারও মর্ম্ম বুঝিলেন না,—বিস্মিত হইয়া তাঁহারা রঘুনাথের কাছে গিয়া তথ্য জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি লজ্জিত হইয়া সমুদয় নিবেদন করিলেন।

আমার দয়াল প্রভুর লীলা এইরূপই বিচিত্র। ভক্ত-মহিমা প্রচারের জন্য এরূপ লীলায় তাঁহার বড়ই আমোদ; কিছু

পূর্ব্বে ঐ প্রভুই নবদ্বীপে মুরারী গুপ্তের এইরূপ মানসিক সেবা গ্রহণ করিয়াছিলেন; তখন এইরূপই তাঁহার পেট ফুলিয়া গিয়াছিল, এবং প্রভাতে গুপ্তের কাছে চিকিৎসার জন্য গিয়াছিলেন।

ইতি-পূর্ব্বার্দ্ধ।

শ্রীমৎ রঘুনাথদাস গোস্বামীর জীবন-চরিত।

উত্তরার্দ্ধ।

রঘুনাথ বৃন্দাবনে।

আবাহন করিলে আবার বিসর্জ্জন করিতে হয়। রামাবতারে পৃথিবীর প্রার্থনায় ব্রহ্মাই ভগবান্‌কে অবনীতে অবতীর্ণ করাইয়াছিলেন, অবশেষে তিনিই দূতরূপে কালকে পাঠাইয়া লীলা সম্বরণের সময় স্মরণ করাইয়া দেন। শ্রীকৃষ্ণাবতারেও ঐরূপই কার্য্য হয়। আর ব্রহ্মা এবং শিব ভিন্ন অন্য কেই বা সে কার্য্য করিবে ?

মহাদেব এই অবতারে শ্রীঅদ্বৈতরূপে শ্রীহট্টের নবগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।* অদ্বৈত প্রভু জগতে ধর্ম্মাভাবাবলোকনে ব্যথিত

---

* "বঙ্গদেশে, শ্রীহট্ট নিকট নবগ্রাম।
সর্ব্বারাধ্য অদ্বৈত্য চন্দ্রের প্রিয় ধাম ॥"
"নবগ্রামে জন্মিলেন, শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র ॥"
জন্মকালে ভুবনে, ব্যাপিল মহানন্দ।"

ভক্তিরত্নাকর।

হইয়া ধর্ম্মের উদ্ধার ও পাপীর নিস্তারার্থ কাতর প্রাণে শ্রীভগবান্‌কে ডাকিতে থাকেন।

শাস্ত্র বলেন যে, যখন ধর্ম্মের নিতান্ত গ্লানি উপস্থিত হয়, যখন ভক্তগণ প্রপীড়িত হইতে থাকেন, যখন বিবিধ উৎপীড়নে দেশ ত্রাহি ত্রাহি করিতে থাকে, তখনই ভক্তের ক্রন্দন ধ্বনিতে শ্রীভগবানের স্বর্গ-সিংহাসন প্রকম্পিত হয়, তখনই তিনি আবির্ভূত হইয়া ভক্তের উদ্ধার সাধন এবং দুষ্কর্ম্মাদের নির্য্যাতন করিয়া থাকেন।

অদ্বৈত প্রভু বিবিধ কারণে জগতের এই ভাবটী বিলক্ষণ রূপে অনুভব করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি প্রতিনিয়ত চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এমন কি সাধন আছে, যাহার বলে তিনি ভগবান্‌কে আকর্ষণ করিতে পারিবেন। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ গৌতমীয় তন্ত্রের নিম্নলিখিত শ্লোকটী তাঁহার মনে পড়িল। শ্লোক যথা—

"তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥"

অদ্বৈত প্রভু এই শ্লোকার্থ যত বিচার করিতে লাগিলেন, হর্ষে এবং প্রেমে ততই বিহ্বল হইতে লাগিলেন। "আহা! আমার প্রভুর কি দয়া! মরি! মরি! কি দয়া! যদি একটী মাত্র তুলসী পত্র বা গণ্ডূষমাত্র জল দ্বারা ভক্তি সহকারে তাঁহার আরাধনা করা যায়, তবে সেই ভক্ত-বৎসল ভক্তের কাছে আত্ম-বিক্রয় করেন। এমন দীন-বৎসল আর কে?" ইহা বলিয়া অদ্বৈত প্রভু উর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। আর এই হইতেই তদ্রূপ সঙ্কল্প পূর্ব্বক শ্রীভগবানের আরাধনা আরম্ভ করিলেন; এই আরাধনাই গৌর অবতারের একটী মুখ্যতম হেতু। অতএব অদ্বৈত প্রভুর-

সার্চ্চন হুঙ্কার ধ্বনিতেই শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হন। অবশেষে যথা-সময়ে ঐ অদ্বৈত প্রভুই, তাঁহার লীলা সম্বরণের জন্য ইঙ্গিত করিয়া, একখানি সঙ্কেত লিপি নীলাচলে প্রভুর কাছে পাঠাইয়া দেন। অদ্বৈত প্রভুর প্রেরিত এই "তর্জ্জা" (প্রহেলিকা, হেয়ালী) পাওয়ার কিছু দিন পর প্রভু এক দিন অকস্মাৎ জগন্নাথ ও গোপীনাথের অঙ্গে যুগপৎ বিলীন হইয়া গেলেন। তখন শক ১৪৫৫, আষাঢ় মাস, এবং সপ্তমী তিথি।

প্রভুর অদর্শনে তদীয় ভক্তগণের দশা কিরূপ হইয়া ছিল, তাহা কেহই বর্ণন করেন নাই, বর্ণনা করিতে ইচ্ছাও ছিল না। কিন্তু তাহা বর্ণিত না থাকিলেও সকলেই বুঝিতে পারেন। এই গ্রন্থের দীন হীন লেখকও তাহা বিস্তার করিতে পারিবে না।

প্রভুর অন্তর্দ্ধানের পরই স্বরূপ ও অন্যান্য ভক্তগণও অন্তর্হিত হইলেন। অচিরেই নীলাচল এবং নবদ্বীপ অন্ধকার হইল। প্রভুর ইচ্ছাক্রমে রঘুনাথ রহিলেন। রঘুনাথ রহিলেন, কিন্তু সে শূন্যপুরী নীলাচলে আর শান্তি পাইলেন না; সুতরাং তিনি সেই ১৪৫৫ শকেই *—তাঁহার ৩৫ বৎসর বয়সের সময় (নীলাচল ত্যাগ করতঃ)

---

* প্রেমাবতার শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শনার্থ যাইতেছিলেন। তিনি পুরীর কিছু দূর থাকিতেই শুনিতে পাইলেন যে, অল্প দিন ধরে প্রভু অন্তর্হিত হইয়াছেন। পরে শ্রীনিবাস যখন ক্ষেত্রে পৌঁছিলেন, স্বরূপকে পাইলেন না, এবং রঘুনাথকেও পাইলেন না। যথা—ভক্তিরত্নাকরে—

"স্বরূপের রঘুনাথে, দর্শন না পাইয়া।
কান্দে শ্রীনিবাস, অতি আকুল হইয়া॥
প্রভুর বিয়োগে, স্বরূপের অদর্শন।
মহাদুঃখে রঘুনাথ, গেলা বৃন্দাবন॥

বৃন্দাবনের দিকে চলিলেন। ইচ্ছা—শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামীকে দর্শনান্তর পর্ব্বত হইতে পড়িয়া দেহপাত করেন। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

"মহাপ্রভুর প্রিয় ভৃত্য, রঘুনাথ দাস।
সর্ব্বত্যাগী কৈল, প্রভুর পদতলে বাস॥
প্রভু সমর্পিল তারে, স্বরূপের হাতে।
প্রভুর গুপ্ত সেবা কৈল, স্বরূপের সাথে॥
যোড়শ বৎসর কৈল, অন্তরঙ্গ সেবন।
স্বরূপের অন্তর্দ্ধানে, আইলা বৃন্দাবন॥
বৃন্দাবনে দুই ভাইর, চরণ দেখিয়া।
গোবর্দ্ধনে ত্যজিব দেহ, ভৃগুপাত করিয়া॥
এইত নিশ্চয় করি, আইলা বৃন্দাবনে।
আসি রূপ সনাতনের, বন্দিল চরণে॥
তবে দুই ভাই তারে, মরিতে না দিল।
নিজ তৃতীয় ভাই করি, নিকটে রাখিল॥
মহাপ্রভুর লীলা যত, বাহির অন্তর।
দুই ভাই তাঁর মুখে, শুনে নিরন্তর॥"

রঘুনাথের জীবনে স্পৃহা নাই, তবে শ্রীরূপ ও সনাতন এবং শ্রীবৃন্দাবন দর্শনের অভিলাষ পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার অন্তরে ছিল; এই অভিলাষ পূর্ণ করতঃ শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপর হইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিবেন, এরূপ সঙ্কল্প করিয়া বৃন্দাবনে আসিলেন। কিন্তু শ্রীরূপ ও সনাতনের স্নেহ ও আগ্রহে দেহত্যাগ করিতে পারিলেন না, বৃন্দাবনেই বাস করিতে লাগিলেন।

এই যে শ্রীরূপ ও সনাতনের নাম করিলাম, ইহাঁরা কে

ছিলেন ? রঘুনাথই বা ইহাঁদিগকে দেখিতে এত উৎসুক কেন ?

শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামী ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ কর্ণাট দেশ হইতে বাঙ্গালায় আগমন করেন। সনাতন গৌড়ের বাদসাহ হুঁসেন খাঁর মন্ত্রী ছিলেন। সনাতনের উপাধি "সাকর মল্লিক।" ইহাঁর কনিষ্ঠ শ্রীরূপ রাজার সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন, ইহার হস্তাক্ষর অতি উত্তম ছিল বলিয়া "দবির খাস" এই উপাধি প্রাপ্ত হন।

যদিও এই ভ্রাতৃযুগল ওরূপ সম্মানিত এবং উচ্চপদে আরূঢ় ও সুবিস্তৃত ভূ-ভাগের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু যখন তাঁহাদের মনে বৈরাগ্য উদিত হইল, তখন অতি তুচ্ছ জ্ঞানে রাজসম্মান ও অতুল ঐশ্বর্য্য মুহূর্ত্ত মাত্রে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত সম্মিলিত হইলেন। কিন্তু প্রভু তাঁহাদিগকে সঙ্গে রাখিলেন না। আপন অভিপ্রায়ানুরূপ ভক্তিগ্রন্থ ও বিলুপ্ত তীর্থ প্রকাশার্থ শক্তি প্রদান পূর্ব্বক বৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন। এখন যে আমরা শ্রীবৃন্দাবনের লীলাস্থলগুলি অবলোকন পূর্ব্বক কৃতার্থ হই, তাহা এই দুই মাহাত্মার প্রসাদাৎ। ইহাঁরাই বৈষ্ণব ধর্ম্মের আদি আচার্য্য—মহাজন। শ্রীবৃন্দাবনে রূপ-সনাতনই প্রভুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত ছিলেন ; প্রভু একমাত্র শ্রীসনাতনকেই নিজ হস্তে পত্র লিখিতেন। অতএব রঘুনাথের তাঁহাদিগকে দেখিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক।

রঘুনাথ রূপ-সনাতনের কাছে রহিলেন, যেন তিনটী ভাই—একে অন্যের প্রাণ স্বরূপ। সেখানে রঘুনাথ আর একটী নিয়ম করিলেন। আহারাদি বিষয়ে নীলাচলে তাঁহার যে নিয়ম ছিল,

তাহা পাঠক মহাশয় জানেন। শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তর্দ্ধানের পর তিনি সে "সুখ অন্ন"ও ত্যাগ করিলেন। এখন কেবল তাঁহার ফল মূল ও কিছু তক্রমাত্র আহারীয় হইল। যথা প্রাচীন পদে—

"রাধা কৃষ্ণ বিয়োগে, ছাড়িল সকল ভোগে,
সুখ রুখ অন্ন মাত্র সার।
গৌরাঙ্গের বিয়োগে, অন্ন ছাড়ি ছিল আগে,
ফল গব্য করিল আহার॥"

তিনি বৃন্দাবনে কি প্রকারে কালযাপন করিতে লাগিলেন, তাহার সংক্ষেপ বর্ণনা এই—

"অন্ন জল ত্যাগ কৈল,—অন্য কথন।
পল দুই তিন মাঠা, করেন ভক্ষণ॥
সহস্র দণ্ডবৎ করে, লয় লক্ষ নাম।
দুই সহস্র বৈষ্ণবেরে, নিত্য পরণাম॥
রাত্রি দিনে রাধাকৃষ্ণের, মানস সেবন।
প্রহরেক মহাপ্রভুর, চরিত্র চিন্তন॥
তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে, আপতিত স্নান।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবেরে করে, আলিঙ্গন দান॥
সার্দ্ধ সপ্ত প্রহর করে, ভক্তির সাধনে।
চারিদণ্ড নিদ্রা; সেহ নহে কোন দিনে॥"

(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।)

রঘুনাথ প্রথমে কএকদিন গোস্বামীদের কাছে রহিলেন, পরে কিছু দিন গোবর্দ্ধনে এবং অবশেষে রাধাকুণ্ডে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়েই তিনি ভুবন-দুর্ল্লভ গ্রন্থ ও পদাদির রচনা করেন।

রঘুনাথদাস নীলাচলে "স্বরূপের রঘু" নামে আখ্যাত হইতেন, বৃন্দাবনে তিনি "দাস গোস্বামী" নামে বিদিত হইলেন। সেখানে তিনি প্রভু দত্ত শিলার সেবা ও ভজন করিতে লাগিলেন।

যথা ভক্তি রত্নাকরে—

"প্রভুদত্ত গোবর্দ্ধন শিলা, গুঞ্জাহারে।
সেবে কি অদ্ভুত সুখে, আপনা পাশরে॥
দিবানিশি না জানয়ে, শ্রীনাম গ্রহণে।
নেত্রে নিদ্রা নাই, অশ্রুধারা দুনয়নে॥
দাস গোস্বামীর চেষ্টা কে বুঝিতে পারে?
সদা মগ্ন রাধাকৃষ্ণ, চৈতন্য বিহারে॥"

ঐ সম্বন্ধে ভক্তমাল কহিতেছেন—

"রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি লাগি, সদা উৎকণ্ঠিত।
সদা হাহাকার, ক্ষণে স্থির নহে চিত॥
হে হে বৃন্দাবনেশ্বরী, হে ব্রজনাগর।
দেখাইয়া শ্রীচরণ, প্রাণ রাখ মোর॥
আহার নিদ্রা নাহি, সদা করয়ে ফুৎকার।
বাহ্য স্ফুর্ত্তি নাহি, সদা যেন মাতোয়ার॥"

শ্রীরাধাকুণ্ড তীরে।

এইরূপে তিনি রাধাকুণ্ড তীরে বাস করিতে লাগিলেন। রাধাকুণ্ড তখন কুণ্ড ছিলেন না, কুণ্ড কাল সহকারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিলেন, এবং তাঁহার স্থানে একটী ধান্য-ক্ষেত্র মাত্র ছিল।

কুণ্ডদ্বয় কোথায় আছেন, ইতিপূর্ব্বে তাহা কেহই জানিত না; পরে শ্রীগৌরাঙ্গ যখন বৃন্দাবনে শুভ বিজয় করেন, তখনই সে ক্ষেত্র কুণ্ড বলিয়া পরিজ্ঞানিত হয়। যথা ভক্তি রত্নাকরে—

"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, বন-ভ্রমণ করিয়া।
এই তমালের তলে, বসিলা আসিয়া॥
অরিষ্ট গ্রামীয় লোকগণে, জিজ্ঞাসিল।
কুণ্ডদ্বয় বার্ত্তা, কেহ কহিতে নারিল॥
সঙ্গেতে আইলা বিপ্র মথুরা হইতে।
তারে জিজ্ঞাসিল, সেহো না পারে কহিতে॥
প্রভু সে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বতীর্থ নিরীশ্বর।
দুই ধান্য-ক্ষেত্র, হইয়াছে কুণ্ডদ্বয়॥
তথা অল্পজলে, স্নান করি হর্ষচিতে।
শ্রীকুণ্ডকে স্তুতি করিলেন নানা মতে॥"

এই ক্ষেত্ররূপ কুণ্ডতীরে বাস করিতে করিতে একদা দাস গোস্বামীর মনে হইল যে, যদি এই কুণ্ডদ্বয় প্রকৃত কুণ্ডের ন্যায় নির্ম্মল সলিলে পূর্ণ হয়, এবং যদি ইহাতে ফুল্ল কমলিনী-দল বিরাজিত হয়, তবে বড় ভাল। কিন্তু,—

"অর্থের আকাঙ্ক্ষা কিছু, ইহাতে বুঝায়।
এত বিচারিতে, হইলেন স্তব্ধপ্রায়॥
আপনাকে ধিক্কার, করয়ে বার বার।
কেনে এ বাসনা, মনে হইল আমার॥" (ঐ)

ভগবান ভক্ত-বাঞ্ছাকল্পতরু, কোন কালে তিনি ভক্তের বাসনা অপূর্ণ রাখেন নাই; আজ রাখিবেন কেন? বদরিকাশ্রমে কোন এক ধনী শ্রীনারায়ণ বিগ্রহ দর্শনান্তর অনেক টাকা সমর্পণ করিলে,

শ্রীনারায়ণ রাত্রে স্বপ্নাবস্থায় তাঁহাকে আদেশ করিলেন— "ঐ মুদ্রা লইয়া অরিষ্ট গ্রামে যাও, তথায় দাস গোস্বামী আছেন, তাঁহাকে দিলেই আমি পাইব। আর তাঁহাকে স্মরণ করাইবে যে, তিনি কুণ্ডদ্বয় সংস্কার করাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন, এই মুদ্রা দ্বারা তাহা করুন।

এতৎ স্বপ্ন দর্শনে সেই ধনী আনন্দিত হইয়া দাস গোস্বামীর সমীপে গেলেন, এবং সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতঃ স্বপ্ন বৃত্তান্ত নিবেদন পূর্ব্বক মুদ্রা প্রদান করিলেন। স্বপ্ন ভাবিয়া গোস্বামী কতক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে সেই ধনীকে প্রশংসা করিয়া কুণ্ডদ্বয়ের পঙ্কোদ্ধার করাইতে কহিলেন। ধনী শীঘ্রই পঙ্কোদ্ধারের জন্য লোক নিযুক্ত করিয়া দিলেন; আর সেই হইতেই রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড প্রকাশিত হইল। শ্রীকুণ্ডদ্বয়কে অভীপ্সিত রূপে সন্দর্শন পূর্ব্বক দাস গোস্বামীর আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। ইহাতেই ঠাকুর নরহরি বলিয়াছেন—"রাধাকুণ্ড বাস, রঘুনাথ কৃপা হৈতে।"

সে যাহা হৌক, বৃন্দাবন তখন বনই ছিল। দাস গোস্বামী কোন ঘরে রহিতেন না, এক বৃক্ষতলে ধ্যানাবেশে বসিয়া থাকিতেন। কত ঝড় বৃষ্টি তাঁহার উপর দিয়া চলিয়া যাইত, বৃষ্টির সময় গোবর্দ্ধনের শিলা ও মালাকে বুকের ভিতর ভরিয়া রাখিতেন, ও আপনি বৃষ্টিতে ভিজিতেন। এক দিন সনাতন গোস্বামী স্নানে আসিয়া দেখেন যে, একটী বৃহৎ ব্যাঘ্র দাস গোস্বামীর পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যাইতেছে। ব্যাঘ্র চলিয়া গেল, কিন্তু তিনি ধ্যানাবেশে কিছুই জানিলেন না। কতক্ষণ পরে বাহ্য জ্ঞান হইলে সনাতন গোস্বামীকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন। অনন্তর নানা কথাবার্ত্তার

পর গোস্বামী তাঁহাকে গৃহে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, এবং তিনিও তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না।

আর এক দিন দাস গোস্বামীর অজীর্ণ হইয়া শরীর ভার ভার হইল, ইহা শুনিয়া প্রসিদ্ধ বল্লবাচার্য্যের পুত্র বিট্‌ঠল নাথ দুই জন চিকিৎসক লইয়া আসিলেন। নাড়ী দেখিয়া চিকিৎসক কহিলেন যে, দুগ্ধান্ন ভক্ষণেই এইরূপ হইয়াছে। সকলেই জানেন—দাস গোস্বামী অন্ন খান না, অতএব এই কথায় বিট্‌ঠল নাথ বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"এ কখনই হইতে পারে না।" দাস গোস্বামী হাসিয়া বলিলেন, "এইই সত্য—আমি মানসে দুগ্ধান্ন প্রসাদ খাইয়াছি।" এতৎ বিবরণ শ্রবণে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

রাধাকুণ্ড বাসে দাস গোস্বামীর এক জন অতি হৃদ্য সঙ্গী ও শিষ্য* ছিলেন—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। ঐ কৃষ্ণদাসই প্রসিদ্ধ চৈতন্য-চরিতামৃত রচয়িতা।

---

* "কবিরাজ শিষ্য, রহিলেন যার কাছে।" প্রেমবিলাস।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ কাঁহার শিষ্য, এ সম্বন্ধে মত-ভেদ আছে। কবিরাজ ছয় গোস্বামীকেই আপন শিক্ষা গুরু বলিয়াছেন। যথা চরিতামৃতে—

"শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গুরু—শিক্ষা গুরু যে আমার।
এই গুরুগণে, আগে করি নমস্কার॥

কিন্তু তথাপি কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার গুরু। আবার কোন কোন সম্প্রদায়ের মত এই যে,—শ্রীরূপের শিষ্য রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, ইহাঁর শিষ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

দাস গোস্বামী মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলার সঙ্গী, কবিরাজ তাঁহার মুখে শুনিয়া শুনিয়া এবং স্বরূপ ও মুরারী গুপ্তের কড়চা দৃষ্টে

পক্ষান্তরে কবিরাজ স্বয়ং চরিতামৃতে) বলিতেছেন—

"নিত্যানন্দ রায়, প্রভুর স্বরূপ প্রকাশ।
তাঁর পাদপদ্ম বন্দো, মুই যাঁর দাস॥"

আবার বলিতেছেন—

যদ্যপি আমার প্রভু, চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি, তাঁহার প্রকাশ॥"

এ দুটী প্রমাণে কি বোধ হয়, পাঠক মহাশয় তাহা বিবেচনা করিবেন। দ্বিতীয়তঃ গুরু এবং কৃষ্ণ অভেদতত্ত্ব, ইহা দেখাইবার জন্য নিত্যানন্দ প্রভু একদা স্বপ্নে তাঁহাকে নন্দ-নন্দন রূপেই দর্শন দেন। (চরিতামৃত ৫ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।)

আবার অনেকেই দাস গোস্বামীকেই কবিরাজের দীক্ষা-গুরু নির্দ্দেশ করেন।

সে যাহা হউক, যদি নিত্যানন্দ প্রভুই (কবিরাজের নিজ বাক্যে) তাঁহার গুরু নির্দ্দেশিত হইলেন, তবে প্রেমবিলাস গ্রন্থে রঘুনাথকে কেন কবিরাজের গুরু বলেন, এই কথার তাৎপর্য্য কি? তাৎপর্য্য প্রেমবিলাসেই আছে। যথা—

"কৃষ্ণদাস কবিরাজ, যবে গৌড় দেশে।
কৃষ্ণের ভজন করে, আনন্দ আবেশে॥
এক দিন ঝামাটপুর, নামে এক গ্রাম।
দর্শন দিলেন, নিত্যানন্দ গুণধাম॥
নিজ সহচর সঙ্গে, বেশ মনোহর।
রূপ দেখি কৃষ্ণদাস, আনন্দ অন্তর॥
প্রণাম করিয়া বহু, করিল স্তবন।
আজ্ঞা হৈল, সর্ব্ব সিদ্ধি যাও বৃন্দাবন॥

চরিতামৃত প্রস্তন করেন। যথা চৈতন্যচরিতামৃতে—

"রঘুনাথ দাসের সদা, প্রভু সঙ্গে স্থিতি।
তাঁর মুখে শুনি লিখি, করিয়া প্রতীতি॥"

"চৈতন্য লীলা রত্নসার, স্বরূপের ভাণ্ডার,
তিঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাহা কিছু যে শুনিল, তাহা এই বিবরিল,
ভক্তগণে দিল এই ভেটে॥"

প্রভু কি ইচ্ছায় রঘুনাথকে এত দুঃখেও রাখিয়াছিলেন, তাঁহার একটী অর্থ বোধ হয় এই—প্রভুর চরিত্র লিখা তাঁহার অসাধ্য, মুখে কহিতেই, মনে ভাবিতেই অধৈর্য্য হইয়া পড়েন, লিখিবেন কিরূপে? কবিরাজ তাঁহার মুখে শুনিয়াই অন্ত্য লীলাটী বিস্তার করিয়া লিখিয়াছেন। দাস গোস্বামীর নিকট প্রভুর অন্ত্য লীলার প্রতিকাহিনী না শুনিলে চরিতামৃত বর্ত্তমানের ন্যায় হইত কি না—তা' প্রভুই জানেন।

দাস গোস্বামীর উপলক্ষে আমরা আর একখানি অমূল্য রত্ন

নিজ গ্রন্থে লিখে, প্রভুর শিষ্য আপনাকে।
না জানয়ে দীন হীন, কৃপা কৈল মোকে॥
পুনর্ব্বার বৃন্দাবন, করিল গমন।
আশ্রয় করিল, রঘুনাথের চরণ॥
কেন হেন লিখে? কেন করয়ে আশ্রয়?
সেই বুঝে,—যার মহা অনুভব হয়॥
সিদ্ধ ব্যবহার এই, অত্যন্ত নির্ম্মল।
ভাবাশ্রয় করিলে, স্ফূর্ত্তি হয়ে যে সকল॥"

পাইয়াছি—সে রত্ন "দান-কেলি-কৌমুদী।" উহা কিরূপে সৃষ্ট হয়, তাহা বলিতেছি।

শ্রীরূপ গোস্বামী "ললিত-মাধব নাটক" প্রণয়ন করিয়া দাস গোস্বামীকে পড়িতে দিলেন। ঐ গ্রন্থে বিপ্রলম্ভ ভাবের এক-শেষ করা হইয়াছে। দাস গোস্বামী ঐ গ্রন্থ পাঠে অধৈর্য্য হইয়া ক্ষণে ক্ষণে ক্রন্দন করেন, কখন বা ভূমে বিলুণ্ঠিত হন। কোন কোন সময় উন্মত্তের ন্যায় গ্রন্থ দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক বসিয়া থাকেন। আবার পরক্ষণেই গ্রন্থ বক্ষে রাখিয়া ভূমে শয়ন করেন।

শ্রীরূপ গোস্বামী রঘুনাথের ঈদৃশ অবস্থা দৃষ্টে শীঘ্র শীঘ্র "দান-কেলি-কৌমুদী নাটিকা" রচনা করতঃ রঘুনাথকে তাহা দিয়া কহিলেন, "ভ্রাতঃ, সংশোধনের জন্য ললিত-মাধব খানা দাও, আর সে কতক দিবস এই নূতন গ্রন্থখানি আস্বাদন কর।"

রঘুনাথ ললিত-মাধব শ্রীরূপ গোস্বামীকে প্রদান করিয়া দান-কেলি কৌমুদী পাঠ করিতে লাগিলেন, আর আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন।

গোস্বামীর গ্রন্থগণ—স্তব বলীর শ্লোক।

পূর্ব্বে দাস গোস্বামীর গ্রন্থের উল্লেখ মাত্র করিয়াছি। বৃন্দাবন বাসকালে তিনি "স্তবমালা" "দান চরিত" ও "মুক্তাচরিত" নামে তিনখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থরত্ন প্রণয়ন করেন। যথা—

"রঘুনাথাভিধেয়স্য তয়োর্মিত্রত্বমীয়ুষঃ।
স্তবমালাদানমুক্তাচরিতং কৃতি যূদিতং॥"

এই গ্রন্থত্রয় ভিন্ন তাঁহার রচিত কয়েকটী পদও আছে। তাঁহার প্রথম পদ শ্রীজয়দেবের বন্দনা সম্বন্ধে। দাস গোস্বামী শ্রীজয়দেবের কাব্য শ্রীগীতগোবিন্দ বড় ভাল বাসিতেন, আর কখন কখন উহা পাঠ করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া থাকিতেন। নীচের পদটীই তাহার পরিচায়ক। পদ যথা—

"জয় জয় শ্রীজয়— দেব দয়াময়
পদ্মবতী রতিকান্ত।
রাধা মাধব, প্রেম ভরতি রস,
উজ্জ্বল মুরতি নিতান্ত॥
শ্রীগীত গোবিন্দ, গ্রন্থ সুধাময়,
বিরচিত মনোহর ছন্দ।
রাধা গোবিন্দ, নিগূঢ় লীলা গুণ,
পদ্মাবলী পদ বৃন্দ॥
কেন্দুবিল্ববর, ধাম মনোহর,
অনুক্ষণ করয়ে বিলাস।
রসিক ভকতগণ, যো সরবস ধন,
অহর্নিশি রহু তছু পাশ॥
যুগল বিলাস গুণ, করু আস্বাদন,
অবিরত ভাবে বিভোর।
দাস রঘুনাথ ইহ, তছু গুণ বর্ণন,
কিয়ে করব নব ওর।
(পদসমুদ্র ৪০১০। পদকল্পতরু ২৪০৮।)

দাস গোস্বামী শ্রীগৌরাঙ্গাবতারের যে কয়েকটী অপূর্ব্ব পদ প্রণয়ন করেন, তাহা এই—

"ব্রহ্ম আত্মা ভগবান, যারে সর্ব্ব শাস্ত্রে গাণ,
দেবা দেবী চরণ বন্দন।
যোগী যতি সদা ধ্যায়, তমূ তারে নাহি পায়,
বন্দো সেই শচীর নন্দন॥
নিজ ভক্তি আস্বাদন, সর্ব্ব ধর্ম্ম স্থাপন,
সাধু ত্রাণ পাষণ্ড দলন।
ইত্যাদি কার্য্যের তরে, শচী জগন্নাথ ঘরে,
নবদ্বীপে লভিলা জনম॥
কনক পূর্ণ চাঁদে, কামিনী মোহন ফাঁদে,
মদনে কদন গর্ব্ব চূর্ণ।
মৃদু মৃদু আধ ভাষা, ঈষৎ উন্নত নাসা,
দাড়িম্ব কুসুম জিনি কর্ণ॥
ঝরে নয়নারবিন্দে, বাস্প নামক রন্ধ্রে,
তারক ভ্রমর হরষিত।
গভীর গর্জ্জন কভু, কভু বলে হাহাপ্রভু,
আপাদ মস্তক পুলকিত॥
প্রেমে না দেখিয়া বাট, ক্ষণে মারে মালসাঠ,
ক্ষণে কৃষ্ণ ক্ষণে বলে রাধা।
নাচয়ে গৌরাঙ্গ রায়, সবে দেখিবারে ধায়,
কর্ম্ম বন্ধে পড়ি গেল বাধা॥
পাইলেন প্রেমধন, নাচয়ে বৈষ্ণবগণ,
আনন্দ সায়রে নাহি ওর।
দেখিয়া মেঘের মেলি, চাতক করিছে কেলি,
চাঁদ দেখি যৈছন চকোর॥

প্রেমে মাতোয়াল গোরা, জগত করিল ভোরা,
পাইল সকল জীব আশ।
জড় অন্ধ মূক মাত্র, সবে ভেল প্রেম পাত্র,
বঞ্চিত শ্রীরঘুনাথ দাস॥”

(পদ-সমুদ্র—৬৪৮২।)

দাস গোস্বামী শ্রীরাধিকার রূপ বর্ণনা করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় যে পদটী লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা দেওয়া গেল—

“চন্দ্রবদনী ধনী, মৃগ-নয়নী।
রূপে গুণে অনুপমা, রমণী-মণি॥
মধুরিম-হাসিনী, কমল-বিকাসিনী,
মতিম-হারিণী, কম্বু-কণ্ঠিনী।
থীর সৌদামিনী, গলিত কাঞ্চন জিনি,
তনুরুচি ধারিণী, পিক-বচনী॥
উজর লম্বি বেণী, মেরু পর যেন ফণী,
আভরণ বহুমণি, গজ-গামিনী।
বীণা-পরিবাদিনী, চরণে নূপুর-ধ্বনি,
রতি রসে পুলকিতা জগমোহিনী॥
সিংহ জিনি মাঝা ক্ষীণি, তাহে মণি-কিঙ্কিণী,
কাঁপি উছলি তনু, পদ অবনী।
বৃষভানু-নন্দিনী, জগজন-বন্দিনী,
দাস রঘুনাথ পহুঁ, মনোহারিণী॥”

(পদ-সমুদ্র—৪০০২। পদকল্পতরু—২৪০০।)

দাস গোস্বামীর আর একটী অনুপম পদ আছে, তাহা শ্রীভগবানের সায়ংকালোচিত আরত্রিকোপযোগী। সে পদটী এই—

"হরল সকল সন্তাপ, জনমকো মিটত,
তলপ যম কাল কি।
আরতি কিয়ে মদন গোপাল কি॥ ধ্রু॥
গোঘৃত রচিত, কর্পূর কি বাতি,
ঝলকত কাঞ্চন থাল কি।
ঘণ্টা তাল মৃদঙ্গ, ঝাঁঝরী বাজত,
বেণু বিশাল কি॥
চন্দ্র কোটী জ্যোতি, ভানু কোটী ছবি,
মুখ শোভা নন্দলাল কি।
ময়ুর মুকুট, পীতাম্বর শোহে,
উরে বৈজয়ন্তি মান কি।
চরণ কমল পর, নূপুর বাজে,
উরুপর বৈজয়ন্তি মাল কি॥
সুন্দর লোল, কপোল ছবি মো,
নিরখত মদন গোপাল কি।
সুর নর মুনিগণ, করতহি আরতি,
ভক্ত বৎসল প্রতিপাল কি॥
ঘণ্টা তাল, মৃদঙ্গ ঝাঁঝরী,
অঞ্জলি কুসুম গোপাল কি।
হুবলি বলি রঘু— নাথ দাস পহুঁ,
মোহন গোকুল বাল কি॥"

(পদকল্পতরু—২৮০২।)

গোস্বামীগণ যত কিছু গ্রন্থাদি করিয়াছেন—সব সংস্কৃতে। দাস গোস্বামীরও পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থগুলি বিশুদ্ধ সংস্কৃতে বিরচিত।

তখন বাঙ্গালা ভাষার অতিশয় শৈশবাবস্থা ; বাঙ্গালায় কিছু লিখিতে বা পড়িতে তখন অল্প ব্যক্তিই যত্ন করিতেন। সেই সময়ে—সেই বঙ্গভাষার আদি সময়ে দাস গোস্বামী বাঙ্গালায় পদ লিখিয়া মাতৃ-ভাষার প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন।

দাস গোস্বামীর এক খানি গ্রন্থের নাম স্তবমালা। কিন্তু শ্রীমদ্রূপ গোস্বামীরও স্তবমালা নামে একখানি গ্রন্থ আছে ; এই জন্য দাস গোস্বামীর গ্রন্থ "স্তবাবলী" নামে আখ্যাত হইল। এই স্তবাবলী কএকটী স্তবের সমষ্টি মাত্র,—২৯ খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ উহার অন্তর্নিবিষ্ট। ইহাতে গোস্বামীর মানসিক ভাবোচ্ছাসের আভাস পাওয়া যায়। এ স্থলে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে। তথাহি স্তবাবল্যাং—

"সদা রাধাকৃষ্ণোচ্ছলদতুল খেলাস্থানে যুজং,
ব্রজং সংত্যজ্যৈতদ্‌যুগ বিরহিতোপি ত্রুটিমপি।
পুনর্দ্বারাবত্যাং যদুপতিমপি প্রৌঢ়বিভবৈঃ,
স্ফুরন্তং তদ্বাচাপি হি নহি চলামীক্ষিতুমপি॥"

অর্থ—যদি আমি সুদীর্ঘ কাল শ্রীকৃষ্ণ বিরহে দগ্ধীভূত হইতে থাকি, এবং (তাহাতে) শ্রীকৃষ্ণ যদি অনুমতিও করেন, তথাপি শ্রীরাধা গোবিন্দের অতুল্য লীলাস্থল সম্বলিত এই ব্রজধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই প্রৌঢ় যদুপতিকে দর্শনের জন্য ক্ষণমাত্রও আমি দ্বারকায় যাইতে পারি না।

রাধা-প্রিয় রঘুনাথের উপরোক্ত ভাব সম্বন্ধে অন্য একটী আখ্যান এস্থলে প্রদত্ত হইল।

দাস গোস্বামীর নিকট দাস নামে এক জন ব্রজবাসী থাকিতেন। উনি গোস্বামীর শিষ্য ও অতি স্নেহ-পাত্র ছিলেন, এবং

গোস্বামীর প্রতি তাঁহারও অচলা ভক্তি ছিল। গোস্বামী বৃক্ষ-পত্রে ভক্ষণ করিতেন, এবং দাস তাহা আনিয়া দিতেন। এক দিন দাস গোস্বামী একটী বৃহৎ পত্র দর্শনে দাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই বৃহৎ পলাশ পত্র কোথায় পাইলে?" দাস বলিলেন, "সখী-স্থলীতে।" সখীস্থলী শ্রীরাধার প্রতিপক্ষ শ্রীচন্দ্রাবলীর বাসস্থান। রাধানুগত রঘুনাথ (রতিমঞ্জরী) সখীস্থলীর নাম শুনিয়া বিরহাভি-মানে ব্যথিত হইয়া পত্র সহিত তক্র ফেলিয়া দিলেন। দাস ইহার কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত ও ভীত হইয়া রহিলে, গোস্বামী কহিলেন—"ওহো, সে চন্দ্রাবলীর স্থান, সেখানে আর তুমি কখনও যাইও না।" ব্রজবাসী তখন সাধকের ভাব বুঝিয়া আর কিছুই বলিলেন না।

দাস গোস্বামী প্রত্যহ দুই তিন পল (১৬ তোলায় ১ পল) মাঠা একটা দোনাতে করিয়া পান করিতেন। বড় পলাশ পত্র হইলে অধিক ধরিবে, এই জ্ঞানেই দাস সখীস্থলীতে বড় পত্র পাইয়া তাহা আনিয়াছিলেন।

বিরহ-যন্ত্রণা,—গোস্বামীর নিয়ম,—সমাপ্তি।

এইরূপে দাস গোস্বামী বৃন্দাবনে আছেন। রাধাকৃষ্ণের এবং শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা স্মরণাবেশে বাহ্যশূন্য হইয়াই অনেক সময় থাকিতেন; কখন কখন বা রূপ সনাতনের নিকট গমন ও তাঁহাদিগকে দর্শন করতঃ দুঃখ জ্বালা নিবারণ করিতেন। কিন্তু

তাহাও আর রহিল না ; প্রভুর বিরহ-জনিত শোক সহ্য করিতে না পারিয়া, সনাতন গোস্বামী এবং তৎপরেই শ্রীরূপ গোস্বামী লীলা সম্বরণ করিলেন,—বৃন্দাবন অন্ধকার হইল। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর তাপিত অন্তর এই কঠোর আঘাতে কিরূপ হইল, তাহা আর কি বলিব ? আবার দিন দিন এক এক জন করে প্রভুর ভক্তগণ অন্তর্দ্ধান করিতেছেন,—গৌড় হইতে এ সংবাদ পাইতে লাগিলেন। জগতে হাহাকার শব্দ উত্থিত হইল, ত্রিভুবন শূন্য—মরুপ্রায় হইল। তখন চতুর্দ্দিক হইতে হঠাৎ কোলাহল—ক্রন্দন শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল, এবং প্রতি স্থলেই অমঙ্গল দৃষ্ট হইল। আর দাস গোস্বামীর তখনকার দশা কহিবার কাহারও সাধ্য নাই। তবে ইহার অনেক দিন পরের কথা এই,—

"কোথা শ্রীস্বরূপ, রূপ, সনাতন, বলি।
ভাসয়ে নেত্রের জলে, বিলুণ্ঠয়ে ধূলি॥
অতি ক্ষীণ শরীর, দুর্ব্বল ক্ষণে ক্ষণে।
করয়ে ভক্ষণ কিছু, দুই চারি দিনে॥

(ভক্তি-রত্নাকরে।)

পদে যথা,—

হা হা, কোথা প্রাণের শ্রীরূপ।
তুমি বিনে এ সংসার, দেখিতেছি অন্ধকার,
হৃদয় হইল বহ্নি-কূপ॥
কেন আগে ভৃগু-পাতে, না করিলুঁ দেহ-পাতে,
এই কি হইল তার ফল ?
এ হৃদয় বজ্রসার, এরূপ নৈলে কি আর,
রহিত রে না হ'য়ে বিকল॥

হে হৃদয়, ফেটে যাও, হে প্রাণ, বাহির হও,
এবে আর রহিয়া কি কায ?
শূন্য ত্রিভুবন ভেল, হৃদয়ে বাজিল শেল,
কি সুখে রহিব ভব-মাঝ ?
আর বেঁচে কাজ নাই, জীবন ধারণে ছাই,
পরাণ ছাড়িলে এবে বাঁচি।
গোসাঞীর বিলাপ-বাণী, এ বৈষ্ণব দাস শুনি
বলে জ্বালা সহিতেই আছি॥

অন্য পদ—

কোথা রূপ মোর প্রাণ ধন।
তুমি বিনে, হাহা নাথ, কোথা যাব আমি হে,
তুমি বিনে না রহে জীবন॥
স্বরূপ, শ্রীসনাতন, গেলেন স্বধামে রে,
রৈলুঁ মাত্র তুয়া মুখ চাঞা।
তুমিও নিদয় হ'য়ে, আমারে ছাড়িয়ে রে,
গেলে হায় হঠাৎ চলিয়া॥
এখন শ্মশান দেখি, এ তিন জগত রে,
তিল মাত্র সোয়াস্তি না পাই।
মনে হয়, মরি মরি, মরিতে না পারি রে,
হায়, হায়, উপায় যে নাই॥
এত দীর্ঘ আয়ু কেন, বিধাতা করিল রে,
কত জ্বালা সহিব এ প্রাণে।
কিম্বা বুঝি আমি বড় অপরাধী হই রে,
তাই মোর না হয় মরণে॥

বৃন্দাবন চন্দ্র সূর্য্য, দুভাই বিহনে রে,
চারি দিক ভেল অন্ধকার।
মরি! মরি! মরি! আর, পরাণে না মানে রে,
থাকিতে এ জগত মাঝার॥
এত বলি কান্দে মোর শ্রীদাস গোসঞীরে,
আহা প্রাণে ধৈর্য্য নাহি ধরে।
অভাগা বৈষ্ণব দাস, আকুল হইল রে,
দুঃখে তার হৃদয় বিদরে॥

শ্রীরূপাদির অন্তর্দ্ধানে দাস গোস্বামীর হৃদয় কিরূপ ব্যথিত হইয়াছিল, তাহার কিছু আভাস তিনি নিজ বাক্যেই দিয়াছেন।

যথা প্রার্থনাশ্রয় চতুর্দ্দশকে—

"শূন্যায়তে মহাগোষ্ঠং গিরীন্দ্রোহ জগরায়তে।
ব্যাঘ্রতুণ্ডায়তে কুণ্ডং জীবাতু রহিতস্য মে॥ ১১॥"
"ন পততি যদি দেহ স্তেন কিং তস্য দোষঃ
স কিল কুলিশ সারৈর্যদ্বিধাত্রা ব্যধারি।
অয়মপি পরহেতু র্গাঢ়তর্কেণ দৃষ্টঃ,
প্রকট কদন ভারং কোবহত্বন্যথা বা॥ ১২॥"

ইহার অনুবাদ,—

জীবন স্বরূপ রূপ, বিহনেতে হায়।
ত্রিভুবন শূন্য ভেল, কিছুই না ভায়॥
কুণ্ড ব্যাঘ্র তুণ্ড প্রায়, গোবর্দ্ধন অহিপ্রায়,
মহা গোষ্ঠ শূন্য বোধ হয়।
শ্রীরূপ বিহনে প্রাণ, স্থির কভু নয়॥ ১১॥

যদি ভৃগুপাতে দেহ পতিত না হয়।
তথাপি দেহের তাতে, কোন দোষ নয়॥
যেহেতু কুলিশ সারে, বিধাতা যতন করে,
এই দেহ করেছে নির্ম্মাণ।
অথবা তর্কের দ্বারে, এ হেতু করেছি স্থিরে,
আমা ভিন্ন অন্য কোন জন।
কখন নারিবে দুঃখ করিতে বহন॥ ১২॥

এই শ্রীরূপ সনাতনাদির বিচ্ছেদ শেল অনেক দিন পরেও তাঁহার হৃদয়ে সম ভাবে বিরাজিত ছিল, ইহা আর হৃদয় হইতে বিদূরিত হয় নাই। ইহার কিছু দিন পরে শ্রীচৈতন্য দাসাত্মজ প্রেমাবতার শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু বৃন্দাবনে গমন করেন, ও তথায় রূপ-সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট সমুদয় বৈষ্ণব-গ্রন্থ অধ্যয়নান্তর সেই গোস্বামীগ্রন্থ সমস্ত প্রচারের জন্য গৌড়ে আসিবার পূর্ব্বে যখন দাস গোস্বামীর নিকট বিদায় লইতে যান, (১৫০৫ শক), তখন তাঁহার অবস্থা বড় শোচনীয়। ভক্তি-রত্নাকর লিখিয়াছেন, তখন তাঁহার দেহ শুষ্ক—অস্থিচর্ম্মসার, কিন্তু তিনি তথাপি নিয়মগুলি অতি কষ্টে পালন করেন। তাঁহার একটী নিয়ম,—বৈষ্ণবদিগকে প্রত্যহ প্রণাম করা; কিন্তু শরীর জীর্ণ শীর্ণ—"বাতাসে হালয়;" এ অবস্থায় প্রণাম করিতে বড় কষ্ট হয়। এ কষ্ট দৃষ্টে যদি কেহ প্রণাম করিতে নিষেধ করেন, তবে তিনি কিছুই বলেন না, দীন হীনের ন্যায় ("ভেকা" হইয়া) নিষেধ-কর্ত্তার মুখপানে চাহিয়া থাকেন। ইহা দেখিয়া কাহার না হৃদয় বিদীর্ণ হয়?

"নিয়ম নির্ব্বাহ যৈছে, যে চেষ্টা অন্তরে।
সে সব দেখিতে কার, হিয়া না বিদরে॥"

নিয়ম কি? কিছু ইতর বিশেষে তাহা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, এখানেও আবার বলিতেছি। এ বৃদ্ধ কালে অশক্তাবস্থায়. তাঁহার নিয়মের শৈথিল্য ঘটিয়াছিল না। "রঘুনাথের নিয়ম যেন পাথরের রেখা।" তাহা এদিক ওদিক হইবার নহে। শেষাবস্থায় দাস গোস্বামী কিরূপে কালযাপন করেন, এবং তাঁহার নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হইয়াছিল কি না, তাহা শ্রীরাধাবল্লভ ঠাকুরের প্রাচীন পদে বিবর্ণিত আছে। যথা—

"ছেড়া কম্বল পরিধান, ব্রজ ফল গব্য খান,
অন্ন আদি না করে আহার।
তিন সন্ধ্যা স্নান করি, স্মরণ কীর্ত্তন করি,
রাধা-পদ ভজন যাঁহার॥
ছাপ্পান্ন দণ্ড রাত্রি দিনে, রাধা কৃষ্ণ গুণ গানে,
স্মরণে সদাই গোয়ায়।
চারিদণ্ড স্তুতি থাকে, স্বপনে রাধাকৃষ্ণ দেখে,
এক তিল ব্যর্থ নাহি যায়॥"
"শ্রীচৈতন্য শচী-সুত, তাঁর গণ হয় যত,
অবতার শ্রীবিগ্রহ নাম।
গুপ্ত ব্যক্ত লীলাস্থল, দৃষ্ট শ্রুত বৈষ্ণব সব,
সবারে করয়ে পরণাম॥"

(ইত্যাদি পদকল্পতরু।)

এই রূপে শ্রীগোস্বামী সদায় রাধাকুণ্ড-তীরে বসিয়া ক্রন্দন করিতেন। যথা—

"হা হা রাধাকৃষ্ণ কোথা, কোথা বিশাখা ললিতা,
কৃপা করি দেহ দরশন।

হা চৈতন্য মহাপ্রভু, হা স্বরূপ মোর প্রভু,
হাহা প্রভু রূপ সনাতন॥
কান্দে গোসাই রাত্রিদিনে, ছাড়ি যায় তনু মনে,
ক্ষেণে অঙ্গ ধূলায় ধূসর
চক্ষু অন্ধ, অনাহার, আপনাকে দেহ ভার,
বিরহে হইল জর জর॥
রাধাকুণ্ড তটে পড়ি, সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি,
মুখে বাক্য না হয় স্ফুরণ।
মন্দ মন্দ জিহ্বা নড়ে, নেত্রে প্রেম অশ্রু পড়ে,
মনে কৃষ্ণ করয়ে স্মরণ॥" (পদকল্পতরু।)

হায়! হায়! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, যখন শ্রীগোস্বামীর অবস্থা এইরূপ দীন হীন প্রায়,—এইরূপ শোকদ্দীপক, তখন তিনি বিয়োগ-যন্ত্রণা সহিতে না পারিয়া ভাবিতেন যে, কিরূপে তাঁহার মৃত্যু হইবে। তখন তিলমাত্র জীবনধারণ তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

যথা কর্ণানন্দে—

"বড়ই বিয়োগে, গোসাঞির কাতর অন্তর।
কিরূপে দেহত্যাগ, ইহা ভাবে নিরন্তর॥"

ইহার পরেও শ্রীগোস্বামী এই ধরাধামে আরও কিছু কাল ছিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ-গৃহিণী শ্রীশ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণী (তাঁহার দ্বিতীয় যাত্রায়ও) বৃন্দাবনে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন;—সে কিছু পরের কথা। তখন দাস গোস্বামীর অতি শোচনীয় অবস্থা। তখন তিনি চলৎশক্তি-রহিত, দৃষ্টি-শক্তি-বিহীন বলিলেও হয়; কাহারও সহিত আলাপ মাত্র করেন না,—এক স্থানে

সদা পড়িয়া থাকেন। তখন গৌরগণ এক প্রকার লুক্কায়িত হইয়াছেন; তাহাতে অবশিষ্ট সকলেরই মন ভঙ্গ,—প্রাণে কাহারও স্পৃহা মাত্র নাই; তবে যে কি জন্য আছেন,—সে এক রহস্যবিশেষ। এই অবস্থায় শ্রীগোস্বামী নির্জ্জন রাধাকুণ্ড তীরে একটী সামান্য গোফায় পড়িয়া রহিতেন। কবিরাজ নিকটেই থাকিতেন, গোস্বামী ক্কচিৎ কবিরাজের সহিত দুই একটী মাত্র কথা কহিতেন। দাস নামক সেই সৌভাগ্যবান ব্রজবাসী তখনও ছিলেন, তিনি প্রাণপণে তাঁহাদের সেবা করিতেন। ঐ সময় ঈশ্বরীর সহিত তাঁহার মিলন হয়। সে সম্মিলনাখ্যান ভক্তি-রত্নাকর হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

"দাস গোস্বামী, সে নির্জ্জন কুণ্ড-তীরে।
করেন শ্রীনাম, গ্রহণাদি ধীরে ধীরে॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ, অগ্রেতে আসিয়া।
দাস গোস্বামীর আগে, ছিলা দাঁড়াইয়া॥
অবসর পাইয়া, করয়ে নিবেদন।
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরীর, হৈল আগমন॥"
"শ্রীঈশ্বরী দেখে, দাস গোস্বামীর গমন।
অতিশয় ক্ষীণতনু, তেজ সূর্য্য সম॥
শ্রীঈশ্বরী অন্তর, বুঝিতে কেবা পারে।
ঝরে দুই নেত্রে বারি, নিবারিতে নারে॥
শ্রীদাস গোস্বামী, প্রণমিতে ধৈর্য্য ধরি।
কৈলা যে উচিত, প্রেমময়ী শ্রীঈশ্বরী॥
শ্রীঈশ্বরী আগে, দাস গোস্বামী যে কয়।
তাহা শুনি কার বা, না বিদরে হৃদয়॥" ইত্যাদি।

এইরূপে শ্রীশ্রীঈশ্বরী জাহ্নবা দেবী দাস গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি কৃপা-পরবশা হইয়া রাধাকুণ্ডে তিন দিন অবস্থিতি করিয়া দাস গোস্বামী এবং অন্যান্য সাধু ভক্ত ও ব্রজবাসীদিগকে প্রসাদ খাওয়াইয়া ছিলেন।

সে যাহা হউক, বৃন্দাবনে গৌরাঙ্গ-পার্ষদ তখন অতি অল্পই ছিলেন। তখন শ্রীলোকনাথ (ইনিই সর্ব্ব প্রথম শ্রীবৃন্দাবন আইসেন) আছেন; তিনিও অতি বৃদ্ধ, কখন কি হয় বলা যায় না।

দাস গোস্বামী মনে ভাবেন, "আমার প্রাণ অতি কঠিন, নতুবা এত গুলি নিদারুণ বিয়োগ যাতনা সহিবে কেন? তবে এই মাত্র অভিলাষ,—যেন শ্রীলোকনাথ গোস্বামী, শ্রীজীব (শ্রীরূপের ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য), ও কৃষ্ণ দাসের অগ্রে দেহত্যাগ করিতে পারি। যথা কর্ণানন্দে—

"এই বৃন্দাবন মোর, সাধন ভজন।
এই স্থানে দেহত্যাগ, আমার নিয়ম॥
ব্রজোদ্ভব ক্ষীর যেবা, আমার ভক্ষণ।
ব্রজ বৃক্ষ পত্র এই, আমার বসন॥
ইহাতেই নির্ব্বাহ, মোর দম্ভ দূর করি।
শ্রীকুণ্ডে রহিয়ে কিবা, গোবর্দ্ধন গিরি॥
রাধা প্রেম সরোবরের, নিকটে নিশ্চয়।
এই স্থানে মরি যেন, হেন বাঞ্ছা হয়॥
শ্রীজীব রহেন যেন, আমার অগ্রেতে।
শ্রীকৃষ্ণ দাস আর, গোসাঞি লোকনাথে॥
দেহত্যাগ করিব আমি, ইহা সবার আগে।
এই দশা কবে হবে, মোর মহাভাগে॥",

এই সম্বন্ধে শ্রীগোস্বামী নিজে যাহা বলিয়াছেন, তাহা শুনুন। যথা স্বনিয়ম দশকে,—

"ব্রজোৎপন্ন ক্ষীরাশন বসন পত্রাদিভিরহং,
পদার্থৈ নির্ব্বাহ্য ব্যবহৃতিমদম্ভংস নিয়মঃ।
বসামীশাকুণ্ডে গিরিকুলবরে চৈব সময়ে,
মরিষ্যেতু প্রেষ্ঠে সরসি খলু জীবাদি পুরতঃ॥"

বলা বাহুল্য যে, দাস গোস্বামীর এই অভিলাষটী অচিরেই পূর্ণ হইয়াছিল; * কিন্তু তাহার বিস্তার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। অত-এব এই খানেই তাঁহার ঘটনা-পূর্ণ পবিত্র চরিত্র পরিসমাপ্ত করিলাম।

দাস গোস্বামী চতুর্নবতি বর্ষ কাল এই ধরাধামে ছিলেন; তিনি ১৫১৪ শকে আশ্বিনের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে দেহ ত্যাগ করেন। ঐ তিথি বৈষ্ণবগণের পালনীয়।

দাস গোস্বামীর অপ্রকটের পর তদীয় শিলা মালা শ্রীশ্রীলোক-নাথ গোস্বামী আপনার স্থানে লইয়া যান। সেখানে শ্রীশিলা "গোকুলানন্দ" নামে পরিপূজিত হন।

উত্তরার্দ্ধ

সমাপ্ত মিতি।

* প্রেমবিলাসানুসারে দাস গোস্বামীর অগ্রে কবিরাজের অন্তর্দ্ধান হয়। কিন্তু যথার্থতঃ প্রেম বিলাসের অর্থ ভিন্নরূপ। প্রেমবিলাসোক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য কর্ণানন্দে আছে। কর্ণানন্দে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, দাস গোস্বামীর পরে কবিরাজ অন্তর্হিত হন। দ্বিতীয়তঃ ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি অন্যান্য প্রমাণ্য গ্রন্থের, বিশেষতঃ বৈষ্ণব দিগ্দর্শিনীর সহিত এতমতের অনৈক্য নাই।

শ্রীমৎ রঘুনাথদাস গোস্বামীর জীবন-চরিত।

অথ চরিত্রানুবাদ।

জয়ধ্বনি কর সবে।
রঘুনাথ রূপে, শ্রীরতি মঞ্জরী,
জনম লভিলা ভবে॥
বাল্য কাল হৈতে, উদাস অন্তর,
উন্মনার প্রায় রয়।
শ্রীগৌরাঙ্গ সনে, মিলিবার তরে,
সদায় ব্যাকুল হয়॥
গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ, বলিয়া একদা,
ঘরের বাহির হৈল।
বার দিনে সেই, দীর্ঘ পথ চলি,
প্রভুর নিকটে আইল॥
দ্বাদশ দিবসে, তিন বার হয়,
আহার সে নাম মাত্র।
দৌড়িয়া গমনে, আপথে কুপথে,
বিদীর্ণ হইল গাত্র॥
পৌছিয়া তথায়, কিবা সে নিয়ম,
শুনিতে বিদরে হৃদি।

কদর্য্য আহার, শড়ি অন্ন আদি,
ছিন্ন বস্ত্র নিরবধি॥
স্বরূপের সাথে, অতি সাবহিতে,
প্রভুর গুপত সেবা।
প্রভু অন্তর্দ্ধানে, অস্থির হইলা,
স্থির বা থাকিবে কেবা॥
তবে প্রভু মোর, পরাণ ত্যজিতে,
শ্রীবৃন্দাবনেতে আইলা।
রূপ সনাতন, যতন করিয়া,
নিজ ভাই করি নিলা॥
পরে দুই ভাই, বিহনেতে তাঁর,
বড়ই দুর্দ্দশা হৈল।
সেই সব কথা, ভাবিতে আমার,
এ প্রাণ ফাটিয়া গেল॥
তার পরে হায়, কি বলিব কথা,
অন্তর্দ্ধান কৈল প্রভু।
সে দুঃখ কাহিনী, আমার অন্তরে,
নাহি পায় যেন কভু॥
তাঁর শ্রীবিগ্রহ, প্রভু দত্ত শিলা,
আর শ্রীগুঞ্জার মালা।
লোকনাথ কাছে, গোকুল আনন্দ,
রূপেতে প্রকাশ হৈলা॥
এই রঘুনাথ, পদে মন প্রাণ,
করিয়াছি সমর্পণ।

হবে কি করুণা, এই হীন প্রতি,
মুই ছার অকিঞ্চন ॥
অভাগা পামর, শ্রীবৈষ্ণব দাসে,
দয়া কর হে গোসাঞি।
তুমি বিনে আর, এ তিন ভুবনে,
আমার আশ্রয় নাই ॥

গ্রন্থ সমাপ্ত।

শ্রীমৎ রঘুনাথদাস গোস্বামীর চরিত্র গ্রন্থ সম্বন্ধে

মতামত।

"এক্ষণে অনেক সদাশয় সাধু-ভক্তের ইচ্ছা যে, দেশে ভক্তি-যোগ বিশেষ রূপে প্রচারিত হয় এবং স্বদেশীয় ব্যক্তিগণ ভক্তি-পথ আশ্রয় করিয়া পরমানন্দে জীবন যাপন করেন। তজ্জন্য অনেক মহাত্মা অনেক প্রকার চেষ্টাও করিতেছেন। কেহ বা ভক্তিগ্রন্থ প্রচার, কেহবা ভক্তি-বিষয়িণী বক্তৃতা দান, কেহবা নাম হট্ট প্রতিষ্ঠা, কেহ বা নিয়মিতরূপে ভক্তি প্রবন্ধ প্রকাশ, নগর সংকীর্ত্তন, ইত্যাদি বহুবিধ কার্য্য করিতেছেন। তাহার কিছু কিছু ফলও হইতেছে। কিন্তু ঐ সকল মহাত্মাগণের মধ্যে যাঁহারা কৃপা করিয়া জীবগণকে ভক্তিপথে লইয়া যাইবার জন্য বৈষ্ণব-চরিত প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহারা আমাদিগের অগণ্য ধন্যবাদের পাত্র। শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপা-ভাজন (অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পাদক) শ্রীযুক্ত বাবু শিশিরকুমার ঘোষ, শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর, প্রভৃতির মধুর চরিত প্রকাশ করিয়া অনেককে কৃতার্থ করিয়াছেন।

সহস্র গ্রন্থ প্রকাশ সহস্র বক্তৃতা দ্বারা যে কার্য্য না হয়, শুদ্ধ ভক্তের ক্ষণিক বৈষ্ণবতা দ্বারা সহজে সে কার্য্য হইয়া থাকে। সম্প্রতি মৈনা নিবাসী পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত বাবু অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় শ্রীরঘুনাথ দাসের অপূর্ব্ব ও অলৌকিক চরিত প্রণয়ন করিয়াছেন! রঘুনাথের চরিত যেমন মধুর, অচ্যুত বাবুর ভাষাও তেমনি সরল ও হৃদয়-গ্রাহী। ঐ চরিতের কিয়দংশ "বৈষ্ণবের"

স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল, বৈষ্ণবের পাঠকগণ অবশ্যই তৎপাঠে সুখ পাইবেন। আমরা প্রার্থনা করি, অচ্যুত বাবু রঘু-জীবনীর অবশিষ্টাংশ এবং তদ্রূপ অন্যান্য গৌরগণের জীবনী প্রকাশে বৈষ্ণবকে প্রকৃত রূপেই অলঙ্কৃত করিবেন।"

বৈষ্ণব পত্রিকা, ৪৪।৪৫ সংখ্যা।

তৃতীয় বর্ষের শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার "তত্ত্ব কথা" বিষয়ের এক স্থানে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার কিয়দংশ এই—"অচ্যুত বাবু পরিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় গদ্য পদ্য ছন্দে প্রভুর লীলা বেশ লিখিতে ও রচনা করিতে পারেন। বৈষ্ণব পত্রিকায় দেখিয়াছি, তিনি শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর যে কিঞ্চিৎ জীবনী লিখিয়াছেন, তাহা অতি চমৎকার হইয়াছে।"

ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় এক খানি পত্রেও লিখিয়াছেন,—"তোমার রচনা সম্পূর্ণ গবেষণা পূর্ণ ও অতি মধুর। আমি যখন বৈষ্ণবে পাঠ করি, তখনই মুগ্ধ হইয়াছিলাম। এক্ষণেও জানিলাম, প্রথমাবধি শেষ লীলা পর্য্যন্ত যাহা যোজনা করিয়াছ, তাহার ভিতর কিছু লিখিতে বাকি নাই। জন্ম ও অন্তর্দ্ধানের শক যাহা উল্লেখ করিয়াছ, তাহাই যথার্থ।"

এ গ্রন্থ সম্বন্ধে আর মতামত উদ্ধৃত না করিয়া "ভক্তিনির্য্যাণ" সম্বন্ধে বাগ্মীপ্রবর ভক্ত-চূড়ামণি পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীল শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয়ের পত্র খানি প্রকাশ করা গেল।

"সচ্চিতানন্দ নিকেতনেষু—

আপনি কৃপা করিয়া যে "ভক্তনির্য্যাণ" পাঠাইয়াছেন, তাহা পাইয়াছি ও এই মাত্র পাঠ করিলাম। বৈকুণ্ঠবাসী ভক্তপ্রবরের

মতামত।

শেষ দিনের বিচিত্র চরিত পাঠ করিতে করিতে অনবরত আমার অশ্রুপাত হইল। ভাবিলাম—ভক্তকে ভগবান অশেষ যাতনার দিনে যদি এত অমৃত ভরা ভাব না দিবেন, তবে তাঁহাকে লোকে "ভক্তবৎসল" বলিবে কেন? হরি ভক্ত নাম করিতে করিতে স্বয়ং পবিত্র হন ও অন্যান্যকেও পবিত্র করেন। ধন্য সেইকুল, যে কুলে ঐ মহাত্মা জন্মিয়াছিলেন, এবং আপনিও ধন্য যে, এই সাধুচরিত লিখিয়া ভক্তগণের চিত্তবিনোদ করিয়াছেন। ইতি।"

সজ্জনতোষিণী পত্রের ৪র্থ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যায় ইহার অন্য সমালোচনা দ্রষ্টব্য। ইতি।

প্রকাশক।

—o—

